আশ্চর্য!

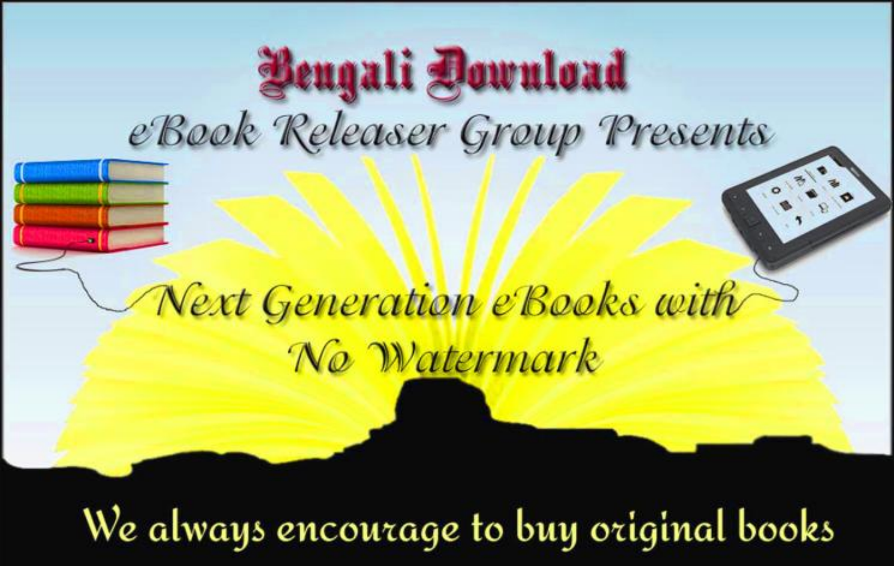
Bengali Download
eBook Releaser Group Presents
Next Generation eBooks with
No Watermark
We always encourage to buy original books

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭
৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

আশ্চর্য!

প্রধান উপদেষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রধান পৃষ্ঠপোষক : সত্যজিৎ রায়
সম্পাদক : আকাশ সেন
প্রকাশক : অসীম বর্ধন, অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স্
৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪

এ মাসে পড়ুন…

উপন্যাস :

রিগেলা গ্রহের হানাদার : শিশির সিংহ ৮

গল্প :

চূড়ান্ত উত্তর : শ্রীধর সেনাপতি ৯৭
জীবন্ত ঈথার : সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় ১০৯
কেউ জানলো না, কি হারালো : বিশু দাস ১১৮
নাড়ুদার বিচিত্র কাহিনী : সুরজিৎ চৌধুরী ১২৭
সব পেয়েছির দেশে : আদিত্য কুমার ভট্টাচার্য ১৩৭

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনেমা :

ফ্যাবুলাস ওয়ার্লড অভ জুল ভের্ণ ১৬৩
এস্ এক দিনে ক্লাবের টুকরো খবর ১৭৩

কালের সেরা কালি

ইজি ফ্লো

ফাউন্টেন পেনের কালি

সলভেন্ট "ই-১০০০ যুক্ত"

গ্রাম:-"হিজিনকো"
ফোন:-২৪-৪৯৭৩

হিন্দুস্থান জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং
৭৬, গনেশ চন্দ্র এভেনিউ • কলিকাতা-১৩

জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

মাসিকপত্র

সগৌরবে দ্বিতীয় বর্ষ চলছে

জনপ্রিয় এই মাসিক পত্রিকাটিতে মানুষের মনের নানা সমস্যা ও প্রতিকার সম্পর্কে সহজ সরল আলোচনা নিয়মিত থাকে।

সম্পাদক : অসীম বর্ধন, এম. এড., এম. এ.

দাম মাত্র ৪০ পয়সা   বার্ষিক চাঁদা ৪৲ : ষাণ্মাসিক চাঁদা ২৲

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস

৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

অদ্রীশ বর্ধন

রচিত ভালো ভালো বই

সমুদ্র শয়তান

বিস্ময়কর সোভিয়েত ছায়াছবির রহস্যঘন বৃহৎ উপন্যাস সদ্য প্রকাশিত,

২৭১ পৃঃ, বিচিত্র অভিনব মলাট, মাত্র চার টাকা

*

রোবার হলেন আকাশরাজা

'নিঃসন্দেহে পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে পারবেন'—আনন্দবাজার

'কাহিনীটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্রীবর্ধন যে সায়ান্স-ফিক্শন রচনায় বিশেষ পারঙ্গম, এই বইখানি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন'—বসুমতী

'চুম্বকের মতো তরুণ মনকে নিবিষ্ট করে রাখবে'—অমৃত

মাত্র এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা

*

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ-রাজার ১৩টি উপন্যাসোপম বেস্টসেলার গল্পগ্রন্থ

৫২০ পৃঃ, ৬৪ খানি ছবি, ২য় মুদ্রণ। দশ টাকা।

'প্রশংসনীয়'—আনন্দবাজার ॥ 'আশ্চর্য'—অমৃত

অ্যাল্ফা-বিটা ॥ ৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪

মুখ
সুস্থ, স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখুন
সাধনা দশন কেবল আদর্শ দন্ত মঞ্জন নহে, ইহা বিশেষভাবে মুখ প্রক্ষালনের কাজও করে।
প্রত্যহ ব্যবহার করুন
সাধনা দশন
SADHANA DASAN
TOOTH POWDER
সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা

ফিটফাট হতে গেলে চাই

লাইজু

হেয়ার ক্রীম

পরিপাটি লোকদের পছন্দ লাইজু।
স্নানের পর অল্প একটু লাইজু বুলিয়ে নিন।
দেখবেন আপনার চুলের কী চেকনাই!
চুল হয়েছে যেমনি নরম, তেমনি চিরুনির
বশ। লাইজু মাখলে চুলের এই
চকচকে ভাবটি সারাদিন অম্লান থাকবে।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের তৈরী

CIC/S BEN

বাঁচতে সবাই চায়

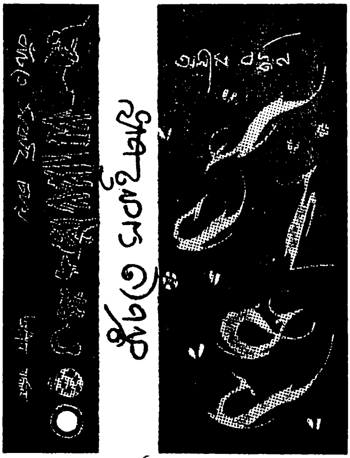

২য় সংস্করণ

অসীম বর্দ্ধন

জীবনের সার্থক পরিতৃপ্তি লাভের

ঘরোয়া আলোচনা

উচ্চ প্রশংসিত, ব্যাপকভাবে সমালোচিত

দাম ৩·৭৫

(ডাকব্যয় ৮১ পয়সা, ভিপি করা হয় না)

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্

মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক

পোস্ট বক্স ২৫৩৭. কলিকাতা ১

৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

M&H TUSSANOL

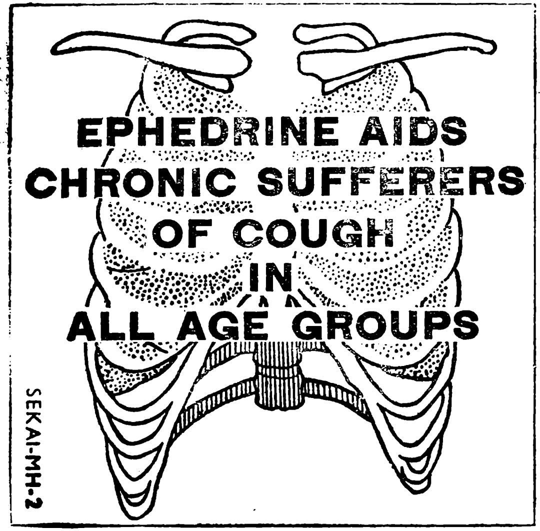

* গলার কষ্ট দূর করে
* শ্বাসনালীর কাজ সবল করে
* ঘন শ্লেষ্মা তরল করে
* শ্লেষ্মা-বার করে দেয়
* শ্বাস প্রশ্বাস সহজ করে

MARTIN & HARRIS PRIVATE LTD.

CALCUTTA-1

রিগেলা-গ্রহের হানাদার

শিশির সিংহ রচিত সম্পূর্ণ উপন্যাস

মস্কোর আকাশে বিকটাকার জানোয়ারের দাপাদাপি, গর্জন, হুঙ্কার আকাশ লালে লাল—হরেকরকম রঙ! বিচিত্র ভোমারগান, পুরুষবেশী নারী-হানাদারের কপালে অত্যাশ্চর্য প্যারালাইজার মণি! চমকপ্রদ ঘটনাবিন্যাসের মৌলিকতায় অদ্ভুত চমৎকার বিজ্ঞানসুবাসিত কাহিনী!

[১]

রাত তখন দু'টো।

একঘেয়ে রুটিন-মাফিক কাজ ক'রতে করতে ক্লান্তি এসেছিলো অভিজিতের, এমন সময় ঘটনাটি ঘটলো নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। তার চমক ক্লান্তি দূর ক'রলো নিঃশেষে, পরিবর্তে কৌতূহল মেশানো উত্তেজনায় ভ'রে উঠলো তার মন।

আকাশের একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে ঘোরানো ছিলো রেডিও-টেলিস্কোপ্‌টার ঝুড়ির মত দেখতে বিশাল আকারের এরিয়ালটা। যে ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়ছিলো রেডিও-টেলিস্কোপ্‌টায়, তা একটা যন্ত্রে দেখা যাচ্ছিলো ঢেউ খেলানো হিজিবিজি রেখার মতো—সংগে সংগে তার প্রতিচ্ছবিও আঁকা হ'য়ে যাচ্ছিল অন্য একটা যন্ত্রে, ভবিষ্যতে পর্যবেক্ষণের জন্য।

দুদিন আগে আকাশের এই জায়গা থেকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে একটা অস্বাভাবিক রেডিও-তরঙ্গ ধরা পড়েছিলো যা আজ পর্যন্ত কোন রেডিও-টেলিস্কোপে ধরা পড়ে নি। কিন্তু তা শুধু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে; তারপর শত চেষ্টা করেও এই দুদিনের মধ্যে আর তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। তরুণ বিজ্ঞানী অভিজিতের ওপর ভার ছিল সেই নিরুদ্দিষ্ট রেডিও-তরঙ্গের সন্ধান করবার, কোন্ মহাজাগতিক পদার্থের থেকে তার উৎপত্তি তার স্বরূপ নির্ণয় করবার। কিন্তু বেচারার দুদিনের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; তার কোন সন্ধানই আর পাওয়া যায় নি।

কিন্তু আজ এই গভীর রাতে সেই নিরুদ্দিষ্ট রেডিও-তরঙ্গ আবার ধরা দিলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। বীক্ষণ-যন্ত্রের পর্দায় আবার ফুটে

উঠলো সেই অস্বাভাবিক তরঙ্গ-রেখা। আবার মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নয়। এক মিনিট—দু'মিনিট—তিন মিনিট—অবিশ্রান্ত ভাবে তরঙ্গ-রেখা হিল্লোলিত হ'য়ে চলেছে যন্ত্রের পর্দার ওপর। অভিজিৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য ক'রলো তরঙ্গ-রেখাগুলি বেশ ছন্দায়িত, সঙ্গীত ধ্বনির 'ওয়েভ প্যাটার্ন' বা তরঙ্গ রেখার মতো।

গ্রহ, নক্ষত্র বা মহাজাগতিক মেঘ থেকে উৎপন্ন যে সব বেতার তরঙ্গ ধরা পড়ে রেডিও টেলিস্কোপে, তা' থেকে এ রকম তরঙ্গ রেখা দেখা যায় না। এর জাতই যেন আলাদা। ঐ বেতার তরঙ্গের 'ফ্রিকোয়েন্সি' (প্রতি সেকেণ্ডে) মনে হলো যে স্বাভাবিক ভাবে কোন জ্যোতিষ্ক বা অন্য মহাজাগতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন নয় ঐ তরঙ্গগুলি। মনে হল কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন।

ঐ বেতার তরঙ্গ কি রকম ধ্বনি উৎপন্ন করে তা' জানবার জন্যে অভিজিৎ একটা যন্ত্রের সুইচ্ টিপে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরীর কক্ষটি ভরে উঠলো এক বিচিত্র ধ্বনিতে। বিচিত্র হলেও বেশ মিঠে আওয়াজ ; অনেকটা অর্গানের দুটো রীড্ ধীরে ধীরে পরপর চেপে চললে যেমন আওয়াজ হয় সেই রকম। অভিজিতের বিস্ময় এবার চরমে উঠলো। রেডিও টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ রকম কোন বেতার ধ্বনি ধরা পড়ে নি মহাশূন্যের কোন স্থান থেকে।

অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার এবং অভূতপূর্বও বটে।

মিনিট পাঁচেক পরে থেমে গেল আওয়াজটা। কয়েক মুহূর্ত অভিজিৎ চুপচাপ বসে রইলো বিস্ময়ের ঘোরে। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তার মস্তিষ্কের কোষে একটা ইচ্ছা বিদ্যুৎ চমকের মতো জাগরিত হয়ে তাকে আবার সক্রিয় ক'রে তুললো। সে ক্ষিপ্রপদে উপস্থিত হ'লো তাদের মহাকাশ গবেষণাগারে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রটার কাছে। তারপর সিন্‌ক্রোনাইজিং সুইচ চেপে দিতেই সেই বিশালকায় দূরবীক্ষণটা তার মজবুত স্ট্যাণ্ডের

উপর ধীরে ধীরে ঘুরতে আরম্ভ করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশের সেই দিকে মুখ ক'রে রইলো যে দিক থেকে ভেসে আসছিলো সেই বিচিত্র বেতার তরঙ্গ। এবার প্রবল কৌতূহল নিয়ে অভিজিৎ চোখ রাখলো দূরবীক্ষণের 'আই পিসের' (eye-piece) ওপর। তার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হ'লো একটা ক্ষুদ্র অথচ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। স্থির ভাবে আলো দিচ্ছে সেটা, তা' থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সেটা একটা গ্রহ।

কিন্তু গ্রহ যদি হয় তাহ'লে সেটা কোন্ গ্রহ? ক্রান্তি বৃত্তের বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে জ্যোতিষ্কটা। মানুষের জানা কোন গ্রহের সেখানে থাকার কথা নয়। তা'হলে ওটা কি হতে পারে? মানুষের তৈরী কোন কৃত্রিম উপগ্রহ? তাই বা কি ক'রে সম্ভব? কোন স্যাটেলাইট তো ওরকম ভাবে আপাতঃদৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকতে পারে না আকাশের বুকে।

তা'হলে কি বুঝতে হবে আকাশ ফুঁড়ে একটা নতুন গ্রহের উদয় হ'য়েছে ওখানে? চিন্তায় কোন কূল কিনারা না পেয়ে অভিজিৎ তার ছাত্রজীবনের গুরু এবং অবজারভেটরীর অধ্যক্ষ ডক্টর প্রাণতোষ দত্তের শরণাপন্ন হবার মনস্থ করলো, তবে প্রথমটায় তার একটু সংকোচ হয়েছিল এতরাত্রে ডক্টর দত্তকে জাগিয়ে বিরক্ত করা হবে ভেবে। কিন্তু তার এই সংকোচ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না কারণ ডক্টর দত্তকে সে ভালভাবেই চেনে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে তিনি সময় অসময় মানেন না। তাঁকে ব্যাপারটা না জানালেই বরং তিনি ক্ষুব্ধ হ'তে পারেন। তাই শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ অবিলম্বে ডক্টর দত্তের বাড়ীতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো।

তার স্কুটারটা বের ক'রে তা'তে চেপে ফুল স্পীডে চালিয়ে নিয়ে চললো রাতের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে। এই অবজারভেটরীটি শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি বিরাট মাঠের ওপর অবস্থিত। আর ডক্টর দত্তের সরকারী কোয়ার্টার সহরের উপকণ্ঠে। কাজেই

অভিজিতকে মাত্র তিন মাইলের বেশী পথ অতিক্রম ক'রতে হবে না। কিন্তু তার মনের অস্থিরতায় এই তিন মাইল পথই তখন তার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন তিনশো মাইল! সুতরাং এমন সাংঘাতিক স্পীডে চালিয়ে নিয়ে চললো তার স্কুটারকে যে ভাগ্যিস ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো তাই রক্ষা, তা না হ'লে একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিলো না।

ডক্টর দত্তের কোয়ার্টারে পৌঁছে যখন তাঁকে ডেকে তুল্লো অভিজিৎ তখন এতো রাত্রে তার এই হঠাৎ আগমনে রীতিমত অবাক হ'য়েই ডক্টর দত্ত বেরিয়ে এলেন ঘুম-জড়ানো চোখে। তারপর অভিজিতের কাছ থেকে যখন তিনি সবিশেষ শুনলেন তখন তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরো গেল বেড়ে। তিনি স্লিপিং গাউন্ পরেই চড়ে বসলেন তাঁর মোটরে। তারপর তাঁর মোটরের পেছনে পেছনে অভিজিৎ তার স্কুটার চালিয়ে নিয়ে চল্লো।

কয়েক মিনিটেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন অবজারভেটরীতে। সেদিন কিসের একটা ছুটি থাকায় অভিজিৎ বাদে সব বিজ্ঞানী কর্মীরাই অনুপস্থিত ছিলেন। শুধু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই সে রাত্রে কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলো সে। সুতরাং কয়েকজন প্রহরী ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। তারা এত রাত্রে বড়সাহেবকে হঠাৎ আসতে হক্চকিয়ে গিয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অবজারভেটরীর নির্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হ'য়ে ডক্টর দত্ত রেডিও-টেলিস্কোপের সুইচ্ টিপলেন. পর্দ্দার ওপর ফুটে উঠলো আবার সেই তরঙ্গ-রেখা। সাউণ্ড-সিস্টেমের সুইচ্ চাপলেন। আবার ধ্বনিত হ'লো সেই বিচিত্র মহাজাগতিক রেডিও-তরঙ্গ।

দত্তসাহেবের চোখে আর পলক পড়ে না। তিনি এবং তাঁর পাশে অভিজিৎ উভয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন সেই বিচিত্র অথচ মধুর ধ্বনি। কয়েক মিনিট এভাবে কেটে যাওয়ার পর ডক্টর দত্ত যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটার কাছে উপস্থিত হ'লেন। আই-

পিসের ওপর চোখ রাখতেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা ক্ষুদ্রাকার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক !

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি সেই রহস্যময় পদার্থটার দিকে। তারপর আর বর্ণালী বিশ্লেষণ ক'রে এবং আরো নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'লেন যে ওটা একটা ক্ষুদ্রাকার গ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি অভিজিতকে বল্‌লেন, "বেশ বোঝা যায় যে আমাদের এই সঙ্গীত-শিল্পী অতিথি একটা প্ল্যানেটয়েড (ক্ষুদ্র গ্রহ) কারণ এর রশ্মি বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেল যে তা' প্রতিফলিত সূর্য-রশ্মি ছাড়া আর কিছু নয়। মনে হয় এর অবস্থান পৃথিবী আর মঙ্গলের মাঝামাঝি। অবিশ্যি এ ব্যাপারে আরো অনেক ক্যালকুলেশন করতে হবে। সে যাই হোক এটার আবির্ভাব হ'লো কি ক'রে তা' তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। এ যে রীতিমত অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ব্যাপার যা কেবল 'সায়ান্স-ফিক্‌শ্যন' গল্পেই পড়া যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার ? যাক্‌গে এ রাত্রে আর কিছু করবো না, এবার ক্ষান্ত হওয়া যাক্। চলো দেখিগে চৌকিদার বাবাজীদের বলে দু'কাপ কফি পাওয়া যায় কি না! বাব্বা, যা স্ট্রেন্ হলো নার্ভ-সিস্টেমের ওপর, এখন এক কাপ ধূমায়মান কফি না পেলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন হ'য়ে যেতে পারে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়সটা তো কম হলো না আমার! তোমার আর কি, তুমি তো ছেলেমানুষ আমার হাঁটুর বয়সীও নও।"

হল্-চমকানো দরাজ হাসি হেসে উঠলেন দত্ত সাহেব আর সেই হাসির ছোঁয়ায় সংক্রামিত হ'য়ে অভিজিৎও হাসতে লাগলো।

পরদিন সকালে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী অভিজিতের সহযোগিতায় অনেক রকম আঁক জোক কষে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে এই জ্যোতিষ্কটি একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝামাঝি থেকে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এর হঠাৎ আবির্ভাব কি ভাবে হলো তা' এঁরা বুঝতে পারলেন না।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দারুন উৎসাহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন সৌরজগতের নতুন অতিথিটিকে। পশ্চিম জার্মানীর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন যে এই গ্রহটি নতুন নয়। এটি আসলে হচ্ছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে যে অ্যাসটেরয়েড (গ্রহাণুপুঞ্জ) রয়েছে তারই একটি, যেটি হার্মিস নামে পরিচিত। কারণ হার্মিসকে আর গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া এর আকার ও আয়তন হার্মিসের মতো।

এই অনুসারে পর্যবেক্ষণ করে সকল দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর মন্তব্য সমর্থন করলেন কিন্তু কেউ বলতে পারলেন না হার্মিস কি ভাবে দল ছাড়া হয়ে স্বাধীন ভাবে গ্রহের মর্যাদা লাভ করলো। বিজ্ঞানীরা নানা রকম অভিমত প্রকাশ করলেন কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলো না। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও হার্মিসের এ রকম আচরণের কোন সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা কেউ করতে পারলেন না। সকলেই এটিকে প্রকৃতি-দেবীর খামখেয়াল বলে মেনে নিলেন। এবং মেনে নিয়ে চুপ করে গেলেন। এই অস্বাভাবিক ঘটনার আবিষ্কারক বলে তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানী অভিজিৎ সিংহ পেল জগৎজোড়া খ্যাতি।

কিন্তু এরপর আরো এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটলো যা সারা পৃথিবীতে সৃষ্টি করলো কল্পনাতীত বিস্ময়ের চমক।

[২]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা মরুপ্রান্তরে একটি বড় সিনেমা কোম্পানীর তাঁবু প'ড়েছে। একটি ঐতিহাসিক কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে টেক্‌নিকলার এবং সিনেমাস্কোপ্‌ পদ্ধতিতে।

বেশ কয়েক কোটি ডলার খরচ হবে এই গল্পটি তুলতে এবং এটি বর্তমান যুগের একটি শ্রেষ্ঠ জাঁকজমক পূর্ণ ছবি বলে গণ্য হবে এই আশা পোষণ করেন কোম্পানীর লোকেরা।

প্রযোজক, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট এবং অন্যান্য টেক্‌নিসিয়ান্ ছাড়া অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যাই হবে প্রায় দেড় হাজার। তাছাড়া ঘোড়া আছে অনেক।

যে কাহিনীটার ছবি তোলা হচ্ছে তার একটা দৃশ্যে মরু অঞ্চলের উল্লেখ আছে তাই ছবিতে বাস্তবতার স্পর্শ দেবার জন্যে প্রযোজক আরিজোনায় শুটিংএর ব্যবস্থা করেছেন।

মোট কথা সে এক এলাহি ব্যাপার! শেষ রাত্রি থেকে প্রস্তুতি-পর্ব চলছে। সকাল আটটায় শুটিং আরম্ভ হবে। চারদিকে কর্ম-চাঞ্চল্য আর ব্যস্ততা। মেক্‌আপ আর্টিস্টরা এতগুলি লোকের মেক্-নিয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। অবিশ্যি অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের বেশ কয়েকজন নিজেদের মেক্-আপ নিজেরা করে নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে মেক্-আপ ম্যানেরা শুধু দেখে নিচ্ছে ঠিক হয়েছে কিনা। এক-আধটুকু 'টাচ্'ও করে দিচ্ছে দরকার হলে। আজ যে 'সিন্' তোলা হবে তার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ— এক দিগ্বিজয়ী বীর একটি রাজ্যে অবাধ লুণ্ঠন ও নরহত্যা করে সসৈন্যে ফিরে চলেছেন তাঁর নিজের রাজ্যে। সংগে তাঁর বিস্তর লুণ্ঠিত ধনরত্ন এবং বিজিত রাজ্যের অসামান্য সুন্দরী বন্দিনী রাজকন্যা। তাছাড়া একদল সুন্দরী নারীও বন্দিনী হয়ে চলেছে সেই সঙ্গে। বন্দিনী রাজকন্যাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করবেন, সেই বীরের এই ছিল অভিলাষ।

তাঁরা চলেছেন এমন একটি প্রান্তরের ওপর দিয়ে যার চারদিক খালি তৃণহীন শিলাস্তূপ। হঠাৎ সেই সকল পাথরের আড়াল থেকে বাঁধ ভাঙা বন্যাস্রোতের মত বেরিয়ে এল একদল দুর্ধর্ষ সৈন্য। তাদের পুরোভাগে রয়েছে দেবদুর্লভ চেহারার অধিকারী এক বীর যুবক। সে পার্শ্ববর্তী এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের রাজপুত্র, সেই বন্দিনী রাজ

কন্যার প্রেমিক। বীর রাজপুত্র তার প্রেমিকাকে সেই দিগ্বিজয়ী বীরের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে মরণপণ করে আক্রমণ করলো শত্রুসৈন্যকে যাদের সংগে সংখ্যাগত তুলনায় তার সৈন্য সংখ্যা প্রায় নগণ্য!

বিখ্যাত পরিচালকের নির্দেশনায় এই দৃশ্যটা ধরে রাখা হবে সিনে-ক্যামেরাগুলিতে।

নিদিষ্ট সময়ে শুটিং আরম্ভ হলো। অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান এবং টেক্‌নিসিয়ানদের সহায়তায় চমৎকার ভাবে এই উত্তেজনাকর দৃশ্যটা সিনে ফিল্‌মের ওপর গৃহীত হতে লাগলো।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অকস্মাৎ ঘটলো একটা অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা!

শুটিং এর স্থানের উজ্জ্বল দিবালোক হঠাৎ নিভে গেল এবং সেখানে নেমে এল আলকাতরার গাঢ় অন্ধকার। সংগে সংগে সকল কোলাহল সকল শব্দ থেমে গেল। অত লোকের কোলাহলমুখর প্রান্তরে বিরাজ করতে লাগলো শ্মশানের স্তব্ধতা!

কিছুক্ষণ পরে স্থানটি আবার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কিন্তু একি?

এতো যে লোক ছিল তারা গেল কোথায়? যেখানকার যা যন্ত্র-পাতি সব ঠিক আছে কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছাড়া আর সব লোক যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। শুধু ঘোড়াগুলি বহাল তবিয়তে বজায় রয়েছে কিন্তু বেচারারা যেন কিসের আতঙ্কে চিঁ চিঁ ক'রে আর্ত-নাদ করছে।

যে দশবার জন লোক অবশিষ্ট ছিল তাদেরও কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রয়েছে তারা। অবিশ্যি কিছু পরেই তাদের সেই আচ্ছন্নভাব কেটে গেল এবং দুটো জীপে উঠে প্রচণ্ডবেগে তারা পালালো সেখান থেকে।

কয়েক মাইল দারুন স্পীডে জীপ চালিয়ে তারা হাজির হলো

একটি পুলিশ আউটপোষ্টে। সেখানে পুলিশ অফিসারকে এই অলৌকিক ঘটনাটি বলায় প্রথমে তিনি ব্যাপারটি গাঁজাখুরী বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের মূর্খ-মাতাল বিশেষণে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে পুলিশবাহিনী নিয়ে গেলেন ঘটনা স্থলে। সেখানে শুধু আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াগুলিই চিঁহি চিঁহি করে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। সবকিছু দেখেশুনে অমন জাঁদরেল পুলিশের লোকদের মুখে আর কথা সরে না!

এমন ব্যাপার ঘটতে পারে না কি? মহাকাশ-ভ্রমণের যুগে এ যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য যাদু কাহিনী! কিন্তু যাদু-কাহিনী নয় তা' তো তারা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছে। সত্যি সত্যি অতগুলো লোক অলৌকিক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

বিহ্বল, বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠে অতঃপর পুলিশ তৎপর হ'য়ে উঠলো সারা দেশে এই অলৌকিক সংবাদ প্রচার করবার জন্যে। নিখুঁৎ বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই খবরটি ছড়িয়ে পড়লো সারা আমেরিকায়। এবং তারপর সারা পৃথিবীতে।

পৃথিবীর সর্বত্র রেডিও, টেলিভিশান্ এবং খবরের কাগজের অফিসগুলি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে এই অবিশ্বাস্য অপার্থিব সংবাদ পৌঁছে দিলো পৃথিবীর প্রায় চারশো-কোটি লোকের কাছে। সারা পৃথিবী যেন স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে উঠলো।

সর্বত্র কত আলোচনা, কত জল্পনা-কল্পনা, কত তর্ক বিতর্ক কিন্তু ঘটনাটির আসল কারণ কেউ বলতে পারলো না। শুধু এটুকু বোঝা গেল, দেহ-মনে যারা সুস্থ-সমর্থ বা বয়সে তরুণ শুধু তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুটিংএর জায়গায় যে দশ বার জন লোক থেকে গেছলো তারা সবাই প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে বার্ধক্যের সীমানা ছুঁই ছুঁই করছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শুধু এইটুকু জানা গেছলো যে

শুটিং চলার সময় হঠাৎ সূর্যের আলো নিভে গেছলো এবং তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিছু পরে তারা যখন জ্ঞান ফিরে পায় তখন দেখে শুধু তারা কয়েকজন বুড়ো আর ঘোড়াগুলি ছাড়া বাকী সবাই বেমালুম নিরুদ্দেশ !

আর এইটুকু জানা গেছলো যে সূর্যের আলো নিভে যাওয়ার ঘটনা শুধু ঐ শুটিংএর জায়গাতেই ঘটেছিল। পৃথিবীর বাকী সর্বত্র (অবশ্য ভূ-গোলকের যে অর্ধেকটায় তখন দিন ছিল) সূর্যের কিরণ অম্লান ভাবেই ছিল। আর কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি।

জনসাধারণ তর্ক করে চুপ করে গেল। গোয়েন্দা-বিভাগ নানা ভাবে তদন্ত করে কোন হদিস্ না পেয়ে হাল ছেড়ে দিল। সাংবাদিক দল অনেক ছুটাছুটি করে শেষটায় রণে ভঙ্গ দিল। বিজ্ঞানীরা নানারকম থিয়োরী বের করেও ঘটনাটির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে না পেরে শেষে ক্ষান্ত হয়ে গেলেন। ধর্মযাজক, সাধু-সন্ত, মোহন্ত-পুরোহিতের দল ঘটনাটিকে ভগবানের অভিশাপ বলে উল্লেখ করে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। মোটকথা পৃথিবীর একটি মানুষের দ্বারাও হলো না রহস্যের কোন সমাধান।

সপ্তাহ দু'য়েক আগে পৃথিবীতে সাড়া পড়েছিল 'হার্মিস গ্রহে'র আবির্ভাবে। সেবারেও ঐ গ্রহ রহস্যের সমাধান কেউ করতে পারেন নি। এবারেও এই অলৌকিক নিরুদ্দেশ রহস্যের ওপর আলোকপাত কেউ করতে পারলেন না।

রহস্য রহস্যই থেকে গেল। এরপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। উপরোক্ত অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক ঘটনার দরুন পৃথিবীতে যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

তারপর ? .

তারপর হঠাৎ একদিন একই রকম ঘটনা ঘটলো অন্য এক জায়গায়। ইংল্যাণ্ডে ব্রাইটনের সমুদ্রোপকূল এবার ঘটনাস্থল। সময়

বসন্তকাল। যথারীতি বহুলোকের সমাগম হয়েছে কর্মজীবনের এক-ঘেয়েমী থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাবার আশায়। স্বাস্থ্যকামী নরনারীর ভিড়ে জায়গাটি গম্‌গম্ করছে। ছেলেমেয়েরা বালির ওপর মনের আনন্দে খেলা করছে। কত যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধা সংক্ষিপ্ত বেশ-বাসে চিৎ বা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বেলাভূমির বালির ওপর রৌদ্র-স্নানের উদ্দেশ্যে। নির্মল নীল আকাশ, উজ্জ্বল দিন। চারদিকে হাসি গল্প-গান—আনন্দের জোয়ার।

সকাল প্রায় ন'টা। এমন সময় ঘটলো সেই অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ সমুদ্রোপকূলের অনেকটা অংশ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল! স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত কোলাহল।

কয়েক মিনিট কেটে গেল এইভাবে।

তারপর হঠাৎ অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার সেখানে দিনের আলো ফুটে উঠলো। তখন বোঝা গেল ঘটনার ভয়াবহতা; প্রায় হাজার তুই লোক উধাও হয়ে গেছে অলৌকিক ভাবে! পড়ে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর নাবালক শিশুদের দল। অনেক শিশু বা বালক বালিকার মা বাপ বা অন্য আত্মীয় এইভাবে উবে যাওয়ায় বেচারাদের সে কি কান্না! পাষাণ গলে যায় সে আকুল ক্রন্দনে। খানিক আগে যেখানে আনন্দের হাট বসেছিল সেখানে এখন সীমাহীন শোকের রাজত্ব!

সমুদ্রোপকূলের যতটা অংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল তার বাইরে আলোকিত অংশে যারা ছিল তাদের কোন ক্ষতি হয় নি। তাদের কাছ থেকে শুধু এইটুকু জানা গেছলো যে উর্ধাকাশ থেকে যেন হঠাৎ একটা গাঢ় অন্ধকারের দেওয়াল নেমে এসেছিলো বেলাভূমিতে। এই অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনায় তারা এতদূর আতঙ্কগ্রস্ত আর কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে সেই অন্ধকারের দেওয়ালের ওপাশে কি ঘটছে তা জানতে চেষ্টা করার সাহস তাদের হয়নি। তাছাড়া অনেকেই পৈত্রিক প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্যে পড়ি কি মরি ক'রে পালিয়েছিল সেই অলক্ষুনে আঁধারের চৌহদ্দি থেকে।

সারা পৃথিবীতে আবার দারুন আতঙ্ক, উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের জোয়ার বইতে লাগলো। এই অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব ঘটনাগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কিন্তু কেউ করতে পারলো না। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির কারবার বেশ জাঁকিয়ে উঠলো। রুই-কাতলা আর চুনো-পুঁটি সব রকম কাগজেরই বিক্রি বেড়ে গেল মারাত্মক রকমের! যেসব লোক জীবনে কোনদিন একখানাও কাগজ কেনেনি, পরস্মৈপদী ব্যবস্থায় কাগজ পড়া ম্যানেজ করতো তারাও এই অলৌকিক ঘটনাগুলির বিবরণ এবং সেই সংক্রান্ত আলোচনা জানাবার জন্যে কাগজ কেনা স্থুরু করে দিল! কাজেই কাগজের চাহিদা হবেই তো।

এইভাবে কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। তারপর তৃতীয় ঘটনা ঘটলো পুরীর সমুদ্রোপকূলে। সেই যথারীতি কিছু জায়গার ওপর দিনের বেলায় আঁধার ঘনিয়ে আসা এবং আঁধার সরে গেলে পর কিছু-সংখ্যক লোক কর্পূরের মত উবে যাওয়া! কিন্তু পুরীর ঘটনায় একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল যে বেশী লোক নিশ্চিহ্ন হয়নি, মাত্র শ'খানেক হবে।

পর পর এরকম তিনটি ঘটনা ঘটায় সারা পৃথিবীতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল তা বর্ণনা করে কাহিনীর গতিতে আর বাধা দিতে চাই না পাঠক (বা পাঠিকা) অনুমান করে নিন এরকম ক্ষেত্রে কি হওয়া সম্ভব।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সাধু-সন্ত, পাদ্রী-পুরোহিত আর গুরুঠাকুরদের এই মওকায় বেশ দু'পয়সা আমদানী হতে লাগলো প্রণামী বা দান হিসেবে।

এঁরা বলতে লাগলেন পৃথিবীতে পাপের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে ভগবান তা সহ্য করছেন না। এজন্যে তিনি নরকের আঁধার পাঠিয়ে মানুষকে শাস্তি দিচ্ছেন এভাবে। পুরীর পাণ্ডা-মোহন্তরা গেলেন সবার ওপরে। তাঁরা বলতে লাগলেন, "দেখলে তো বাছাধনরা, পৃথিবীর আর দু'জায়গায় এরকম ঘটনায় হাজার হাজার লোক জাহান্নামে

গেল কিন্তু আমাদের এখানে গেল কত ? না, মোটে একশো ! এটা সম্ভব হ'ল কিসে ? না. মহাপ্রভু জগন্নাথের মাহাত্ম্যে ! অতএব যেখানে যত পাপী-তাপী আছো সব চলে এসো আমাদের শ্রীক্ষেত্রে। মহাপ্রভুকে দর্শন করে পাপমুক্ত হও। জগন্নাথ রক্ষা করবেন তোমাদের।"

এরপর সত্যি সত্যি ভিড় সামলাতে রাজ্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'ল। তবু কি সামলানো যায় না কি ? কত দুর্ঘটনা ঘটতে লাগলো ভিড়ের দরুণ।

পাণ্ডাঠাকুরের দক্ষিণার পয়সা দু'হাতে লুটতে লাগলেন এমনভাবে যে তার বিশদ বিবরণ দিলে পাঠকের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং থাক সে কথা।

একবার একজন তরুণ দর্শনার্থী ভিড়ের একজন পাণ্ডাঠাকুরকে বলে ফেলেছিল, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, মহাপ্রভু জগন্নাথের এতই যদি মাহাত্ম্য তা'হলে তাঁর এলাকায় এমন ঘটনা ঘটলো কেন ?"

আর যায় কোথায় ? পাণ্ডাঠাকুর তো রেগে খাপ্পা। ছড়ি উঁচিয়ে তেড়ে এলো সেই অর্বাচীন ছোক্রার দিকে। চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "তু কিসঅ কহুছু বে, পাপী কাঁহি-কি ! তু নরককু যিবু মু কহি দেলি (তুই কি বলছিস্ পাপী কোথাকার ! আমি বলছি তুই নরকে যাবি)" ছোকরারো রক্ত গরম। আস্তিন গুটিয়ে সেও এগিয়ে এলো তেড়ে। কিন্তু তার সঙ্গী একজন ভারিক্কী চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক সঙ্গীন পরিস্থিতিটাকে সামলে নিলেন কোনোরকমে। তিনি সেই ছেলেটিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আঃ গদাই, কি হচ্ছে, থাম তো দেখি। মাপ করুন ঠাকুর মশাই, ছেলে মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলেছে। ছেড়ে দিন।" পাণ্ডাঠাকুরের তবু রাগ যায় না। ফোঁস ফোঁসে করে বলে, "সে পিলা হেলা কিম্তি ? মুহরে এতে নিসঅ ! (ও ছেলেমানুষ হল কেমন করে ? মুখে এত গোঁফ।)"

সেই ভদ্রলোক তাঁর চকচকে টাকটায় বার দুয়েক হাত বুলিয়ে

বললেন, "গোঁফ বেরলে কি হবে ওর বুদ্ধি এখনও পাকে নি ঠাকুর মশাই! বুঝছিস না কেন গদাই, এখানে যেসব পাষণ্ডেরা এসেছিল শুধু ফুর্তি করতে, মহাপ্রভুকে দর্শন করে নি শ্রীক্ষেত্রে এসেও, তাদেরই গ্রাস করেছে ভগবানের পাঠানো অন্ধকার। যাক বাদ দিন সে কথা। ভাল করে প্রভুকে দর্শন করিয়ে দিন ঠাকুর মশাই, মোটা রকমের প্রণামী দেব।"

এবার পাণ্ডাঠাকুরের রাগ জল। সে এবার গালভরা হাসি নিয়ে বললো, "যাক, ছেলেমানুষ, ক্ষমা ঘেন্না করে নিলাম। আপনি ঠিক বলেছেন বাবুমশাই। জগন্নাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পাপীদের পরিণাম কি!"

মত অনুযায়ী পৃথিবীর লোক তিন দলে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম দল (এই দলেই বেশী লোক সব চাইতে) ঘটনাগুলিকে ভগবানের অভিশাপ বলে মেনে নিয়ে মন্দির মসজিদ গির্জায় ধন্না দিতে লাগলো ভগবানের আশীর্বাদ পাবার আশায়। দ্বিতীয় দল ঘটনাগুলিতে ভগবানের কোন দায়িত্ব আছে বলে বিশ্বাস না করলেও দেবদর্শন বা প্রার্থনা উপাসনা থেকে বিরত থাকলো না। বলা তো যায় না কিসের থেকে কি হয়!

আর তৃতীয় দল (এই দলের সংখ্যা সবচেয়ে কম) ঘটনাগুলির মধ্যে ভগবানের হাত আছে বলেও বিশ্বাস করলো না বা ঠাকুরদেবতার ধার দিয়েও গেল না। ওদের ধারণা ব্যাপারগুলির মধ্যে কোন অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে। এই দলের লোকেরাই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলো।

অনেকেই পুরীর ঘটনার ব্যাখ্যা সেই ভদ্রলোকের মতই করলো। যারা পুরীতে গিয়েও জগন্নাথ দর্শন করে না তাদের পরিণাম ঐরকমই হয়। এটাই হয়ে দাঁড়ালো সর্ববাদী সম্মত ধারণা। ফলে পুরীতে পুণ্যকামীদের ভিড় বাড়তে লাগল। যারা তা' বিশ্বাস করলো না তারা প্রবল জনমতের চাপে চুপ করে থাকতে বাধ্য হ'ল। কারণ

পুরীর ঘটনার বৈশিষ্ট্যের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তারা দিতে পারলো না।

আর সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে চলতে লাগলো অনেক বাদানুবাদ, জন্ম হল অনেক থিয়োরীর। আবার নাকচও হল অনেক থিয়োরী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই আণবিক শক্তি আর মহাকাশ ভ্রমণের যুগেও পৃথিবীর বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরাও হার মানলেন ঘটনাগুলির একটা সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে! তবে একটা বিষয়ে তাঁরা সকলে একমত হলেন যে অতঃপর পৃথিবীর যেখানে যত রেডিও টেলিস্কোপ আর রাডার আছে সবগুলিকে সর্বদাই সক্রিয় রেখে মহাকাশে দিবারাত্র পর্যবেক্ষণের একটা ব্যবস্থা করা হোক। কে জানে মহাকাশ থেকে এই আচমকা বিপদগুলি আসছে কি না। সন্দেহজনক কোন কিছু দেখলেই ব্যালিষ্টিক মিসাইল দিয়ে তা ধ্বংস করবার চেষ্টা করা হবে।

বিজ্ঞানীদের এই নির্দেশ অনুযারী পৃথিবীর চারদিকে মহাকাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হল। উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটতে লাগলো পর্যবেক্ষণকারীদের। কিন্তু কথামালার একচক্ষু হরিণের গল্পের মতো বিপদ এলো অন্যদিক থেকে।

[৩]

কাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মঙ্গল গ্রহ অভিযান পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বিশেষ ধরনের রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের কেপকানাভেরাল্ থেকে। কোটী কোটী টাকা খরচ হয়েছে এই পরিকল্পনার পেছনে। টাকার অংক শুনলে আমাদের হৃদস্পন্দন জন্মের মত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে কাজেই সেটা না জানাই ভালো।

আমেরিকা এবং রাশিয়ার সেরা মহাকাশ-বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদেরা

মিলে এই রকেট তৈরী করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে মার্শিয়ান্ এক্সপ্লোরার। এই রকেটটা মহাকাশ পাড়ি দিয়ে মঙ্গল গ্রহে নেমে যাবে এবং বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে মঙ্গল গ্রহের ওপরের ছবি তুলবে। সেই ছবি টেলিভিশনে এই জগতের বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে ভেসে আসবে। এই রকেটের মধ্যে যে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে তা' প্রায় তিনমাস কার্যকরী থাকবে। সুতরাং মঙ্গল গ্রহে যদি কোন প্রাণী থাকে তাহলে এই মাসের মধ্যে মার্শিয়ান এক্সপ্লোরারের টেলিভিসন ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যে আসবে এমন আশা করা চলে। অতএব এই রকেট মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দেবে যা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত আছে।

নিরলস কর্মী প্রতিভাবান মানুষের সৃষ্টি অতি জটিল যন্ত্রপাতিতে ভরা এই রকেট মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর করে তুলবে সুতরাং এই মহৎ প্রচেষ্টা সকলের প্রাণভরা অভিনন্দন লাভ করেছে।

পঞ্চাশ মিটার উঁচু রকেটটা আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লনচিং প্যাডের ওপর। নীল আকাশের পটভূমিকায় তার উজ্জ্বল ধাতবদেহ সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব দৃশ্য, যা' প্রচার করছে মানুষের বিজ্ঞানের মহিমা।

রকেট ছাড়বার আর দেরী নেই। সাংবাদিক, প্রেস-ফটোগ্রাফার এবং আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন লনচিং প্যাড্ থেকে নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ দূরত্বে। তবে প্রজেক্ট মার্স-এর কর্মীদের উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ সব থেকে বেশী তা' বলাই বাহুল্য।

এবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সাইরেন বেজে উঠলো তীব্র আওয়াজ তুলে। সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন। ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা বাগিয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ বাজবার পর হঠাৎ থেমে গেল সাইরেন। অ্যাম্‌প্লিফায়ার্ থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো —"ফায়ারিং সেক্‌শান! গেট রেডী! মাইনাস্ থার্টি সেকেণ্ড……

টোয়েন্টি সেকেণ্ড……টেন্ সেকেণ্ড……ফাইভ্ সেকেণ্ড……ফোর…
…থ্রি……টু……ওয়ান……ফায়ার!"

চোখ-ঝল্সানো আলোর শিখা এবং নীলাভ ধোঁয়া বেরোতে লাগলো রকেটটির নীচ থেকে প্রচণ্ড শোঁ শোঁ গর্জ্জন তুলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 'মার্শিয়ান্ এক্সপ্লোরার' বিদ্যুৎ-গতিতে উঠে গেল নীল আকাশে। পেছনে পড়ে রইলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অল্পক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল রকেটটি। কিন্তু চর্মচক্ষুর দৃষ্টির বাইরে গেলেও যান্ত্রিক চক্ষুর দৃষ্টি-সীমার মধ্যেই মহাকাশ পাড়ি দিয়ে চললো 'মার্শিয়ান এক্সপ্লোরার'। রাডারের পর্দায় এবং দূরবীক্ষণে তার গতি পরিষ্কার ভাবে দেখা যেতে লাগলো।

রকেটটি থেকে তার নির্বিঘ্নে চলার সংকেত আসতে লাগলো বেতার-তরঙ্গ মারফৎ—পিঁপ্—পিঁপ্ পিঁপ্ আওয়াজ তুলে। পৃথিবীর অধিকাংশ অব্জারভেটরী তার গতিপথ অনুসরণ করতে লাগলো।

আশ্চর্য কৌশলে নির্মিত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রকেটটির গতিপথ একচুলও এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। স্বচ্ছন্দ গতিতে 'মার্শিয়ান্ এক্সপ্লোরার' এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যের দিকে।

পৃথিবী থেকে দশ লক্ষ কিলোমিটার যাওয়ার পর রকেটটি থেকে বিচ্ছুরিত হ'লো বিশাল সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ। সেই বিশাল বাষ্পরাশি সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হ'ল। আগে থেকেই রকেটটির সৃষ্টিকর্তারা এরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে 'মার্শিয়ান এক্সপ্লোরার' তার যাত্রার পথে তিনবার এরকম উজ্জ্বল মেঘ সৃষ্টি করবে মহাকাশে—উদ্দেশ্য, পৃথিবীর মানুষের কাছে তার নির্বিঘ্ন যাত্রার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাঠানো।

প্রথমবারের সোডিয়াম বাষ্পের মেঘ পৃথিবীর অনেকেই সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেল। 'প্রোজেক্ট মার্স'-এর

কর্মীদের মনে বইতে লাগলো আনন্দের জোয়ার কারণ বহু গবেষণায় এবং পরিশ্রমে তৈরী তাঁদের মানসপুত্র 'মার্শিয়ান এক্সপ্লোরার' আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ-গতিতে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যাভিমুখে। সুতরাং এমন আশা এখন অনায়াসে পোষণ করা যেতে পারে যে প্রোজেক্ট মার্স এর পরিকল্পনা সার্থক হবে।

নিখুঁত কার্যকারিতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ সোডিয়াম্ বাষ্পের মেঘ পেছনে ফেলে 'মার্শিয়ান্ এক্সপ্লোরার' এগিয়ে চলেছে অভ্রান্ত ভাবে মহাকাশ বিজয়ীর গৌরব নিয়ে। শক্তিশালী রাডারেব পর্দায় তার গতি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ছে।

কিন্তু এ কি ? হঠাৎ কেন অদৃশ্য হয়ে গেল রকেটটি। রাডারের পর্দায় আর তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন ? বেতার সংকেতও যে আর শোনা যাচ্ছে না! যে সব অবজারভেটরী থেকে তার গতিপথ অনুসরণ করা হচ্ছিল সেখানকার পর্যবেক্ষকেরা শত চেষ্টা করেও আর তার কোন পাত্তা পেল না। বিস্ময়কর ভাবে মহাকাশে মিলিয়ে গেছে রকেটটা। যেন উবে গেছে কর্পূরের মতো।

'প্রজেক্ট মার্স'-এর কর্মীদের মাথায় যেন বাজ পড়লো। অপরিসীম হতাশা, গ্লানি আর দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন তাঁরা। সারা জগতের বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই অচিন্তনীয় এবং অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের সংবাদে।

[৪]

সাইবেরিয়ার বলখাস্ হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শো কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এক জনহীন প্রান্তরে একদল রাশিয়ান ভূ বিজ্ঞানী ও খনিজতত্ত্ববিদ্ ঐ অঞ্চলে কয়লা, হীরা এবং আরো কয়েকটি মূল্যবান খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। জায়গাটাকে ঠিক প্রান্তর বলা চলে না কারণ তার উত্তর দিকে পূর্ব

পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা এবং প্রায় পঞ্চাশ মিটার উঁচু একটা শিলাস্তূপ রয়েছে ; তাছাড়া এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে নানা আকারের ও বর্ণের প্রস্তর খণ্ড।

অভিযাত্রীদের তাঁবু প'ড়েছে ঐ শিলা শ্রেণীর দক্ষিণে এক জায়গায়। মেরু অঞ্চল হতে আগত হিম শীতল বায়ুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের তাঁবুর জন্যে এই স্থানটি মনোনীত করেছেন। সময়টা শীতকাল ; তাঁবুর উত্তর দিকের ঐ শিলা শ্রেণী হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাসটাকে অনেকটা আটকে রেখেছে।

এই দলে সবশুদ্ধ জন পঞ্চাশেক লোক আছেন, তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানী রয়েছেন দশজন। বাকী সকলেই মেকানিক্, শ্রমিক, ট্রাক্টর এবং জীপের ড্রাইভার এবং রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজ করবার জন্য পরিচারক ও পরিচারিকা।

এই দশজন বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুজন মহিলা বিজ্ঞানী আছেন। অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক হচ্ছেন তরুণ বিজ্ঞানী নিকোলাই গ্রাডভ।

স্থানটিতে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা প্রস্‌পেক্টিং-এর কাজ চালিয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। একটি সুবিস্তৃত কয়লাস্তরের অস্তিত্ব জানতে পারা গেছে। তা ছাড়া হীরা, অভ্র এবং 'পেট্রোলিয়াম'-এর অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সাইবেরিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী এই স্থানটিতে শিল্প সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর বিজ্ঞানীরা বেরিয়ে পড়লেন তাঁদের কাজে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে জায়গার ওপর দিয়ে পর পর চলেছে পাঁচটি ডিজেল চালিত বিশেষ ধরনের ট্রাক্টর। প্রতি ট্রাক্টরের উপরিভাগে ড্রাইভার নিয়ে তিন জনের বসবার জায়গা আছে। আটজন বিজ্ঞানী আজ বেরিয়ে পড়েছেন এই দলে। বাকী দু'জন তাঁবুতে রয়ে গেছেন 'প্রস্‌পেক্টিং-এ পাওয়া খনিজ পদার্থগুলির নমুনা

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে।

আজ এঁদের গন্তব্যস্থল শিলাশ্রেণীর পূর্বদিকের অঞ্চল। তাঁবু থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার যাওয়ার পর শিলাশ্রেণী শেষ হয়ে এল। ওঁরা শিলাশ্রেণীকে বাঁয়ে রেখে মোড় ফিরলেন উত্তর দিকে। অধিনায়ক নিকোলাই ছিলেন সামনের ট্রাক্টরে। তিনি তাঁর সঙ্গিনী মহিলা বিজ্ঞানী নাটাশা পাভলোভাকে বললেন, "আর একটু এগিয়ে গিয়ে থামা যাবে, কি বল নাটাশা?" তরুণী নাটাশা মৃদু হেসে জবাব দিল, "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমি আর কি বলব বলুন!"

নিকোলাই ও নাটাশা বসেছিলেন পেছনের সীটে। এই সুযোগে সুন্দরী নাটাশার একখানি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সুদর্শন বিজ্ঞানী নিকোলাই মৃদুস্বরে বললেন, "তোমার কি বলার কিছুই নেই প্রিয় বান্ধবী?" তাঁদের এই বিশ্রম্ভালাপে বাধা পড়লো ট্রাক্টরটি হঠাৎ থেমে যেতে। নিকোলাই ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কি হল জর্জি, হঠাৎ থামলে কেন?"

উত্তরে জর্জি দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললো, "সামনে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন স্যার!"

ওর নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। ওঁদের কাছ থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে কতকগুলো পাথরের স্তূপ। ঐ স্তূপের পাশে একটি অদ্ভুত এবং বিকট চেহারার বিরাট জীবকে দঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

প্রাণীটি দেখতে অনেকটা গিরগিটির মত। উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এঁদের দিকে পেছন ফিরে। ইতিমধ্যে পাঁচটি ট্রাকটরই থেমে গেছে এবং এ অদ্ভুত জীবটি সকলেরই নজরে পড়েছে এরকম প্রাণী কেউ কোন দিন দেখেন নি। সকলেই ট্রাক্টার থেকে নেমে এক জায়গায় জড়ো হলেন।

নিকোলাই তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "প্রাণীটিকে দেখতে অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসারের মত। অবিশ্যি মুখটা কেমন

দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এরকম জায়গায় এটি এলো কেমন করে? আর একটু এগিয়ে দেখা যাক্, কি বলেন আপনারা?”

বলা বাহুল্য এ প্রস্তাবে সকলেই রাজী হয়ে যে যার ট্রাক্টরে উঠতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে সকলে চমকে উঠলেন। মাটি কেঁপে উঠলো সেই গর্জ্জনে। দেখা গেল সেই অদ্ভুত জীবটা এঁদের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছে। কী ভয়ঙ্কর সেই গর্জ্জন! অতি বড় দুঃসাহসীরও দাঁতকপাটি লেগে যাবে সেই গর্জ্জন শুনলে। অভিযাত্রীদের মনে হতে লাগলো সেই গর্জ্জনের শব্দ-তরঙ্গ যেন নিরেট হয়ে তাঁদের দেহে এসে ধাক্কা দিচ্ছে! আকাশ আর পৃথিবী যেন ফেটে যাবে সেই প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কায়।

এবার সেই বিরাট জানোয়ারটা ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ালো চুপ করে। এতক্ষণ যার দেহের বিশালতাই চোখে পড়ছিলো এবার তার ভয়াবহতাও বোঝা গেল। উঃ কী ভয়ঙ্কর চেহারা! খুব ভয়ের দুঃস্বপ্নেও বুঝি এমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখা যায় না। দেহটা অনেকটা গিরগিটির মত কিন্তু ঘন নীল বর্ণ। দেহবর্ণ থেকে যেন একটা অপার্থিব জ্যোতি বেরোচ্ছে। সারা দেহে বড় বড় কাঁটা সজারুর মত, কিন্তু অত ঘন নয়। জানোয়ারটার আটখানা পা, সামনে চারখানা, পেছনে চারখানা। কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর তার মুখখানা। বিরাট গোলাকার মাথা, মাঝখানে সোজা ছুঁচালো একটা শিং, ঘোর রক্ত বর্ণের। কান দুটো এরোপ্লেনের ডানার মত চওড়া থেকে খানিকটা সরু হয়ে গেছে। গোল গোল বিরাট চোখ দুটো লাল রং-এর ইলেক্ট্রিক বাল্বের মত জ্বলছে। নাকটা থ্যাবড়া ছিদ্র দুটো বড় বড় আর মুখের হাঁ কী বড়! আস্ত একটা হাতীর জায়গা হয়ে যাবে সেই মুখ-গহ্বরে! এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত বসানো সাদা ঝক্ঝকে দাঁতের সারি আয়নার মত জ্বলজ্বল করছে।

সব মিলিয়ে অতি ভয়ঙ্কর সেই জানোয়ার!

মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের মত এই জীবটা যদি আক্রমণ করে তাহলে

আত্মরক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না। মাত্র গোটা তিনেক রাইফেল ছাড়া আর কোন অস্ত্র আনা হয় নি এই অভিযানে। কারণ এরকম ক্ষেত্রে, নিছক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে অস্ত্রের প্রয়োজন কোথায়? যে ক'টা রাইফেল আনা হয়েছে সেগুলি আবার তাঁবুতে থেকে গেছে, ওঁদের কাছে কিছু নেই। থাক্‌বার মধ্যে আছে কতক-গুলো প্রস্‌পেক্টিং-এর যন্ত্র আর গোটা কয়েক ডিনামাইট্। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে ডিনামাইট-এর বিস্ফোরণ করে জানোয়াটাকে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছু করা যাবে না। কিন্তু ওই বিশাল ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা কি ডিনামাইট্-এর বিস্ফোরণে ভয় পাবে?

ওঁরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। ওরকম অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব জন্তুটাকে ভাল করে জানবার কৌতূহলও হচ্ছে, আবার সামনে দেখতেও সাহস হচ্ছে না। যদি আক্রমণ করে তাহলে ওই বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষার কোন উপায় থাক্‌বে না। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত জন্তুটা অহিংস ভাব নিয়ে নির্বিকার হয়ে আছে, আক্রমণাত্মক কোন মনোভাব দেখায় নি, শুধু বারকয়েক গর্জ্জন করা ছাড়া। হয় তো এমনও হতে পারে ভয়ঙ্কর চেহারা সত্ত্বেও জীবটা নিরীহ। ওকে না ঘাঁটালে হয়তো কাউকে কিছু বলে না।

নিকোলাই এবং তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ঐসব আলোচনা হচ্ছিলো এমন সময় হঠাৎ আবার দানবটি হুংকার করে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে আসতে লাগলো এঁদের দিকে গর্জ্জন করতে করতে। আশ্চর্যের বিষয় আটখানা পা থাকলেও জন্তুটা চলছে ধীরে ধীরে মাতালের মত টলমল করতে করতে। বোধ হয় ওর দেহের বিশাল ভারই ওর এরকম মন্দগতির কারণ।

এবার আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চোখ দুটো থেকে যেন সার্চ্-লাইটের মত তীব্র আলো বেরোচ্ছে। আর বিদ্‌ঘুটে শিংটার আগা থেকে যেন অতি উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক্ স্পার্ক বেরোচ্ছে। আকাশবাতাস কাঁপিয়ে হুংকার করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে

আসতে লাগলো দানবটা। নিরেট মূর্খ ছাড়া নিরস্ত্র অবস্থায় সেখানে কেউ অপেক্ষা করবে না। কাজেই পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে সকলে ট্রাক্টরে চড়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন ক্যাম্পে। এসে দেখলেন ক্যাম্প থেকে একটি সাহায্যকারী দল রাইফেল নিয়ে এঁদের কাছে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছিলেন। ঐ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ক্যাম্পের লোকেরা শুনতে পেয়ে ভেবেছিলেন হয়তো তাঁরা কোন ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কবলে পড়েছেন কাজেই ওঁদের সাহায্যের জন্যে যাওয়া দরকার।

ক্যাম্পের লোকেরা তাদের ফিরে-আসা দলটির কাছ থেকে ঐ ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বিবরণ শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অনেকেই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁদের ধারণা হ'ল মোটে তিনটে রাইফেল দিয়ে ঐ পাহাড়ের মত জানোয়ারটার কিছু করা যাবে না।

এখন কিন্তু আর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে না। কে জানে জানোয়ারটা চুপি চুপি এদিকে আসছে কি না? প্রায় পঞ্চাশ মিটার উঁচু প্রস্তর স্তূপের ঠিক নীচেই তাঁবু ফেলা হয়েছে বলে ওপাশে অর্থাৎ উত্তর দিকে কি ঘটছে বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেই আতঙ্কিত মন নিয়ে প্রস্তর-স্তূপের পূর্বপ্রান্তে তাকিয়ে রইলেন। কারণ জানোয়ারটার ঐদিক থেকেই আসবার সম্ভাবনা বেশী।

নিকোলাই তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জরুরী আলোচনা-সভা বসালেন। প্রথমে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল যে অবিলম্বে রেডিও-ট্রান্স্মিটার দ্বারা এ খবর পাঠানো হোক্ মস্কোস্থিত অ্যাকা-ডেমি অফ্ সায়েন্সের হেড কোয়ার্টারে। এঁদের সাহায্যের জন্যে এবং রক্ষা করবার জন্যে যা' করা দরকার তা' কর্তৃপক্ষ করবেন।

প্রস্তাব অনুযায়ী শক্তিশালী পোরটেবল্ ট্রান্সমিটার দ্বারা বিস্তারিত সংবাদ জানানো হ'ল কর্তৃপক্ষকে। তাঁরাও চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এই খবর শুনে। নিকোলাই-এর দলকে অভয় দিয়ে তাঁরা বললেন, "বাছাধনেরা, তোমরা কোনরকম করে আর কয়েকঘণ্টা টিঁকে

থাকো। দরকার হলে শীগ্‌গির পালাও ওখান থেকে, ভারী যন্ত্রপাতি-গুলো না নিয়েই। তোমাদের দাম যন্ত্রপাতিগুলো থেকে অনেক বেশী। তোমরা বুদ্ধিমান, আশা করি ঘণ্টা তিনেকের জন্যে পৈত্রিক প্রাণগুলি বজায় রাখতে পারবে। আমরা শীগ্‌গির জানোয়ারটাকে খতম করবার জন্যে উপযুক্ত লোক আর অস্ত্র পাঠাচ্ছি। তোমাদের নিকটবর্তী আল্‌মা-আটার আর্মি হেড্‌ কোয়ার্টার থেকে ওরা অবিলম্বে রওনা হবে।"

নিকোলাই এবং তাঁর সঙ্গীরা আশ্বস্ত হলেন এই খবর পেয়ে। এদিকে জানোয়ারটার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় এদিকে আর এলো না। কে জানে কি ব্যাপার?

নিকোলাই-এর ট্রাক্‌টর চালক জর্জি নিকোলাইকে বললো, "এই পাথরগুলোর মাথায় চড়ে একবার দেখবো না কি স্যার, ওপাশে কি করছে হতচ্ছাড়া জানোয়ারটা?"

নিকোলাই অবাক হয়ে বললেন, "বল কি হে, এমন খাড়াই পাথর-গুলো বেয়ে উঠতে পারবে ওপরে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ খুব পারবো," মোলায়েম হাসি হেসে জবাব দিল জর্জি, "ঈগল পাখীর বাসা থেকে ঈগলছানা চুরি করবার জন্যে এর থেকেও দুর্গম জায়গায় উঠেছি ছেলেবেলায়। একবার তো পড়ে গিয়ে ডানহাত আর ডান-পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছলো। নেহাত কঠিন প্রাণ তাই মরি নি।"

এই বিপদের সময়েও নাটাশা তার স্বভাব-সুলভ রসিকতা করে বললো, "ভাগ্যিস্‌ মারা যাওনি জর্জি, তাহলে আমাদের ট্রাক্‌টর চালাতো কে?"

সকলে হেসে উঠলো নাটাশার কথা শুনে। যাই হোক নিকোলাই-এর অনুমতি পেয়ে জর্জি আশ্চর্য নিপুণতায় সেই বিদখুটে ভাঙ্গাচোরা পাথরগুলোর গা বেয়ে প্রায় টিক্‌টিকির মত উঠতে লাগলো। সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট

রয়েছে। একবার হাত-পা ফস্‌কালে আর রক্ষা থাকবে না। পাথরে পাথরে আছাড় খেতে খেতে দেহটা চুরমার হয়ে পড়বে নীচে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা ঘটলো না। জর্জি নিরাপদে উঠে গেল ওপরে। সেখান থেকে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটার দেখা পেল না। ভারী আশ্চর্যের বিষয় তো! অতো বড় বিশাল জন্তুটা গেল কোথায়? ওর বিরাট দেহটা লুকোবার মত কোন জায়গাই তো নেই কোথাও। এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে যে সব পাথর তার আড়ালে শেয়াল বা বড় জোর বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে কিন্তু অতো বড় জন্তু তো পারে না। তাহলে কোথায় গেল পাহাড়ের মত সেই জন্তুটা?

জর্জি নেমে আসবার পর তার মুখে এ খবর পেয়ে সকলেই অবাক হলেন খুব। ব্যাপারটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য, ভোজবাজীর মত চমকপ্রদ। কিন্তু ব্যাপারটা তো ভোজবাজী নয়। এতগুলো সুস্থ-মস্তিষ্ক, বুদ্ধিমান লোকের চোখের সামনে দিনের বেলায় এ রকম পরিবেশে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল সেটাকে আর যাই হোক ভোজবাজী তো বলা চলে না। ব্যাপারটার কোন কূলকিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে হেড্-কোয়ার্টাস থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত সতর্কভাবে অপেক্ষা করা হবে। এ ছাড়া তো বর্তমান অবস্থায় করবার কিছু নেই।

আপাতত প্রস্‌পেক্টিং-য়ের কাজ স্থগিত রাখা হল। সুবিধা-জনক জায়গায় সতর্ক প্রহরী মোতায়েন রেখে অভিযাত্রী দল মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন তাঁবুতে।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে যাবার পর অবশেষে তাঁদের কানে ভেসে এল বহু দূরের আকাশ থেকে এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেন সেই শব্দে। সুদূর আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেখা গেল কয়েকটি কালো বিন্দু। কালো বিন্দুগুলি দেখতে দেখতে আকারে বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে স্পষ্টভাবে দেখা গেল চারটে হেলিকপ্টার্ গম্ভীর গর্জ্জন তুলে এগিয়ে আসছে তাঁবুর দিকে। নিশ্চয় আল্মা-আটার আর্মি হেড্-কোয়ার্টার্স থেকে সাহায্য আসছে। আর ভয় নেই। উৎসাহ ও সাহসে ভরে উঠলো অভিযাত্রীদের মন। দেখতে দেখতে হেলিকপ্টার চারটে তাঁবুর কাছে এসে নেমে পড়লো! সেইগুলি থেকে নেমে এল যোলজন সশস্ত্র ইউনিফর্ম্ধারী সৈন্য। অভিযাত্রীরা সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন আগত সৈন্যবাহিনীকে।

এরকম স্তরময় প্রান্তরে হেলিকপ্টার ছাড়া অন্য কোন রকম বিমান নামতে পারবে না বলেই আর্মি হেড্-কোয়ার্টার থেকে বিশেষ-নির্মিত হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে। ওগুলি রাশিয়ার নতুন তৈরী নাম 'হেলিপ্লেন'। আকাশে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা থেকে ঘণ্টায় চারশো' মাইল উড়ে যাওয়া—এর মধ্যে যে কোন গতিবেগে আকাশ পরিক্রমা করতে পারে এবং একবার তেল নিয়ে বহুদূর উড়ে যেতে পারে। প্রত্যেকটাতে মেশিনগান বসানো হয়েছে। তা ছাড়া রেডিও-অ্যাক্টিভ্ বোম্ ছোঁড়বার ব্যবস্থা রয়েছে একটাতে। সবদিক দিয়েই চমৎকার ব্যবস্থা, হেড-কোয়ার্টারের অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ।

ঐ সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডার পোপোকভ নিকোলাই এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, প্রস্তরস্তূপের কাছে জন্তুটাকে থম দেখা গেছলো তাকে কেন্দ্র করে অন্তত পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাওয়া যায় তার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালানো হবে। চারটি 'হেলিপ্লেন' সেই

...পটিকে কেন্দ্র করে চারটা বিভিন্ন দিকে যাবে জন্তুটার খোঁজে! দেখতে পেলেই মেসিন্‌গান থেকে গুলী বর্ষণ করে তাকে মেরে ফেলা হবে। তাতেও যদি কিছু না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত ছোঁড়া হবে রেডিও-অ্যাক্‌টিভ্‌ বোম্‌। আর পরিত্রাণ নেই বাছাধনের!

আলোচনার শেষে সকলেই ধূমায়মান কফির কাপে চুমুক দিয়ে কফিতৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন কিন্তু নিঃশেষে পান করা আর হয়ে উঠলো না। হঠাৎ একটা আকাশ ফাটানো ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দারুন ভাবে চমকে উঠলেন সকলে। কারো কারো হাত কেঁপে গিয়ে কাপ থেকে কফি চল্‌কে পড়লো পোষাকের ওপর।

নিশ্চয় গর্জ্জন করছে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা। মনে হচ্ছে কাছেই আছে। কি আশ্চর্য! মাটি ফুঁড়ে বেরোলো না কি? জর্জি তো তাকে দেখতে পায়নি তা হলে কোথায় ছিল এতক্ষণ জানোয়ারটা?

আর ভাববার সময় নেই। সেই মূর্তিমান বিভীষিকার সংগে মোকাবিলা করবার সময়এসে গেছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কম্যাণ্ডার পোপোকভ তাঁর সৈন্যদের তাড়াতাড়ি হেলিপ্লেনে উঠতে আদেশ দিলেন। হেলিপ্লেন চারটি আকাশে উঠে পড়লো অবিলম্বে। পরস্পরের মধ্যে নিয়মমাফিক ব্যবধান রেখে উড়ে চললো উত্তর দিকে।

ঐতো সেই সাংঘাতিক জন্তুটা দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের স্তূপটার কাছে। কী ভয়াল চেহারা! দুঃসাহসী কম্যাণ্ডার এবং তাঁর দুঃসাহসী সৈন্যরা সকলেই সেই কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন। কোন পার্থিব জন্তুর যে এরকম ভয়ঙ্কর চেহারা থাকতে পারে তা' তাঁদের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার।

এরকম ভয়ঙ্কর জন্তুর সংগে প্রথম সাক্ষাতে মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে কম্যাণ্ডার আদেশ দিলেন গুলী করতে।

একসঙ্গে চারটি হেলিপ্লেন থেকে চারটে মেশিনগান গর্জন করে উঠলো।......

ঝাট-টাট-টাট-টাট-টাট-টাট······

ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট গিয়ে বিঁধতে লাগলো জন্তুটার গায়ে। যেন মুষলধারে বুলেট বৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, জন্তুটার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তা'তে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে বিরাট লেজটা নাড়তে লাগলো আর ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পাঁয়তারা কষতে লাগলো, তেড়ে এল না বা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো না।

অভিযাত্রীরা প্রথমে যখন তাকে দেখেছিলেন তখন ভয়ঙ্কর গর্জন করা ছাড়া আর কোন রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখা যায় নি। অভিযাত্রীদের দিকে ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু আক্রমণ করবার চেষ্টা করে নি। তা ছাড়া অভিযাত্রীরা যখন তাঁবুতে ফিরে এসেছিলেন ততক্ষণ তো সে খুঁজে খুঁজে তাঁবুর কাছে এসে আক্রমণ করতে পারতো কিন্তু তা' সে করেনি। এতো ভয়ঙ্কর চেহারা কিন্তু স্বভাবে সম্পূর্ণ অহিংস। তারপর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর এই বুলেট-বৃষ্টি অম্লান বদনে সহ্য করা। কম্যাণ্ডার ভাবলেন সমস্ত ব্যাপারটাই ভারী অদ্ভুত! যাই হোক্ আর গুলী না চালিয়ে অহিংস ভাবে কাছে এগিয়ে জন্তুটাকে পর্যবেক্ষণ করলে কেমন হয়?

এরকম সিদ্ধান্ত করে পোপোকভ্ রেডিও ট্রান্সমিটার মারফৎ আদেশ দিলেন মেসিনগান থামাতে।

গুলী বৃষ্টি থেমে গেল।

এবার কম্যাণ্ডার অন্য তিনটে হেলিপ্লেনকে আদেশ দিলেন কিছুদূরে আকাশে অপেক্ষা করতে। সকলের ওপর ঝুঁকি নিতে চান না তিনি। কাছ থেকে জন্তুটাকে দেখতে গিয়ে যদি কোন বিপদ হয়! ওদের সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে যাবেন দেখতে। অবিশ্যি পাইলট এবং তিনজন সৈন্য তাঁর বিমানে থাকছে; উপায় থাকলে ওদেরও বাদ দিতেন তিনি। কিন্তু তা' তো হবার নয়

কাজেই তিনি ছাড়া ঐ কজনের ওপরও ঝুঁকিটা নেওয়া হচ্ছে। কি আর করা যায়?

কম্যাণ্ডারের আদেশে অন্য হেলি তিনটে কিছুদূর উড়ে গিয়ে আকাশে স্থির হয়ে রইলো।

পোপোকভের বিমান ধীরে ধীরে ভেসে চললো সেই ভয়ঙ্কর জন্তুর দিকে। অন্য তিনটে হেলির আরোহীরা উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল নিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পোপোকভ্ তাঁর মুভি-ক্যামেরায় নানা ভাবে জন্তুটার ছবি তুলতে লাগলেন। তাঁর হেলি বিপদজনক ভাবে নিকটস্থ হয়ে পড়লো কিন্তু জন্তুটা তবু আক্রমণ করলো না। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর গর্জনে কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল।

এবার পোলোকভের বিমান এতো কাছে এসে পড়েছে যে সেই জন্তুটা গলা বাড়িয়ে আঘাত করতে পারে। কিন্তু তবু কিছু করলো না জন্তু া।

ধন্য দুঃসাহসী পোপোকভ্! ধন্য তাঁর সঙ্গীরা! দানবটার ভয়ঙ্কর মুখের সামনা-সামনি মাত্র পাঁচ-ছ' মিটার দূরে এসে পড়েছে তাঁদের হেলিপ্লেন্টা। পোপোকভ্ ভালো একটা 'ক্লোজ আপ্' ফটো তুলে নিচ্ছেন তাঁর মুভি-ক্যামেরায় কিন্তু······কিন্তু হঠাৎ এ কি! এ কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অতো বিরাট ভয়ঙ্কর জন্তুটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! ম্যাজিকের মতো!

এই অকল্পনীয় ঘটনার চমকে পোপোকভ্ ও তাঁর সঙ্গীরা মোহাবিষ্টের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁরা জেগে আছেন না স্বপ্ন দেখছেন? বাস্তব জগতে এমন ঘটনা, এমন অঘটন ঘটতে পারে?

ইতিমধ্যে অন্য তিনটি হেলিবিমানের আরোহীরা এই চমকপ্রদ অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে কাল বিলম্ব না করে পোপো-কভের বিমানের কাছে এসে পড়লো।

যেখানে সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা দাঁড়িয়ে ছিল সকলের দৃষ্টি পড়লো সেই জায়গাটার ওপর। কোন চিহ্নই নেই সেখানে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে সেই দানবটা। খালি ইতস্ততঃ ছড়ানো পাথরগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

পোপোকভ আদেশ দিলেন ওখানে নেমে পড়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করতে। ধীরে ধীরে নেমে এলো হেলিবিমানগুলি। সকলেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়বার মত অবস্থা। উত্তেজনা এত বেশী!

সকলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন। শিলাময় স্থানটার ওপর কোন পদচিহ্ন থাকবার কথা নয়। কিন্তু অন্য কোন রকম চিহ্ন যদি দেখতে পাওয়া যায়! খুঁটিয়ে দেখা হতে লাগলো সমস্ত জায়গাটা।

কি অবাক কাণ্ড, গোটা জায়গাটা মেসিনগানের বুলেটে ভর্তি। এদিক ওদিক চারদিকে ছড়ানো রয়েছে অজস্র বুলেট। জন্তুটাকে লক্ষ্য করে সে সব গুলী করা হয়েছিল মেসিনগান থেকে, সেই সব বুলেট। তাহলে কি জন্তুটার গায়ে বুলেট বেঁধেনি? হয় তো তার দেহটা এমন যার ওপর মেশিনগানের বুলেট লাগলেও ঠিক্‌রে যায়, বেঁধে না। কিংবা এমনো হতে পারে যে জন্তুটার দেহের উপাদান কোন গ্যাসীয় পদার্থ। তাই বুলেট স্বচ্ছন্দে চলে যায় তার ভেতর দিয়ে অথচ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু সে অদৃশ্য হয় কেমন করে?

পোপোকভ আর তাঁর সহকর্মীরা এদিক ওদিক ঘুরছেন আর ভাবছেন। কিন্তু ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছেন না।

হঠাৎ একজনের চিৎকারে সকলের চিন্তাসূত্রে বাধা পড়লো। একটা পাথরের ক্ষুদ্র ঢিপির কাছে দাঁড়িয়ে তাঁদের একজন সঙ্গী সৈনিক চেঁচিয়ে বলছে কম্যাণ্ডারের উদ্দেশ্যে, "স্যার, স্যার, এদিকে আসুন, দেখে যান।"

সকলেই ছুটলেন সেদিকে। কাছে যেতেই সৈনিকটি সকলের

দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো টিপিটার একদিকে। দেখা গেল চৌকো বাক্সের মত চকচকে কি একটা রয়েছে সেখানে। ঘনকের আকার, দৈর্ঘ-প্রস্থ উচ্চতা সমান। প্রতি মাত্রার আনুমানিক মাপ কুড়ি সেন্টি মিটারের বেশী নয়।

পোপোকভ জিনিষটাকে হাতে তুলে নিলেন। উজ্জ্বল সোনালী রং র বেশ হাল্‌কা জিনিষ, প্ল্যাস্টিকের মত কোন পদার্থে তৈরী। একদিকে রেডিওর মত 'গ্রিল্‌' বা জালি লাগানো। কিন্তু আর তিন দিক মসৃণ; ছোট্ট স্ক্রু পর্যন্ত নেই কোথাও। জিনিষটা কি রেডিও না অন্য কিছু? কিন্তু রাশিয়ার মতো বিজ্ঞানে অতো উন্নত দেশের লোক হয়েও পোপোকভ আর তাঁর সঙ্গীরা ওরকম কোন রেডিও বা অ্যাম্‌প্লিফায়ার দেখেন নি কখনো।

পোপোকভ জিনিষটাকে একজন সৈনিককে দিকে বললেন, "এটাকে রাখ তো হে! হেড কোয়ার্টারে গিয়ে বিজ্ঞানীদের দেখাতে হবে। ওঁরা যদি বলতে পারেন ওটা কি।"

তাঁর অধীনস্থ অফিসার ক্যাপতেন কুলিক বললেন, "কিছুক্ষণ আগে ওখানে ছিল সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা। আর ভোজবাজীর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর পাওয়া গেল সেই অজ্ঞাত পরিচয় যন্ত্র। সমস্ত ব্যাপারটা বড্ড বেশী অলৌকিক, বড্ড বেশী অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে স্যার।"

"তা' তো হচ্ছে," পোপোকভ জবাব দিলেন, "কিন্তু যে বস্তু আমরা এখানে পেলাম সে তো অবাস্তব নয়। রীতিমত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কঠিন একটি পদার্থ এটি। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেটা এখানে আসলো কেমন করে? সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটার সংগে তার কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

ক্যাপটেন কুলিক মন্তব্য করলেন, "থাকতে পারে স্যার, কিছুই বিচিত্র নয়। কিছুকাল ধরে পৃথিবীতে, শুধু পৃথিবী বা বলি কেন, মহাকাশেও যেরকম কত রকম যে অলৌকিক ঘটনা ঘটছে তাতে কোন কিছুই আর অসম্ভব নয়। কাল থেকে সূর্য যদি পশ্চিম দিকে

ওঠে তাহলেও বোধ হয় আমাদের অবাক হওয়া চলবে না স্যার।”

ক্যাপটেন কুলিকের সেই সরস মন্তব্যে সকলেই হেসে উঠলেন। কিন্তু ওদিকে আবার আর এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হলো। যেখানে ঐ বাক্সের মতো রহস্যময় যন্ত্র পাওয়া গেছলো তার অল্প দূরে বড় পাথরের পাশে দেখা গেল এস্কিমোদের বরফের বাড়ী ইগলুর মতো আকারে পাথরের স্তূপ। বেশী বড় নয় বড়জোর এক মিটার উঁচু আর ব্যাস দু'মিটারের বেশী নয়। ছোট পাথর দিয়ে গঠিত, মনে হয় কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবে ওরকম স্তূপ গড়ে উঠতে পারে না কৃত্রিমতার ছাপ স্পষ্ট।

সকলেই অবাক হয়ে স্তূপটার কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ালেন। কাছে আসতেই দেখা গেল ঢিপিটার ওপরে চকচকে কি একটা চৌকা মতো জিনিষ পড়ে আছে। পোপোকভ সেটাকে হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সক্ষম হলেন না। জিনিষটা যেন জোরালো আঠা দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা পাথরের ওপর।

কিছুতেই সেটাকে ওঠাতে সক্ষম না হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত যে পাথরটার ওপর আটকানো ছিল সেই পাথরটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে দু'হাতে ধরে দেখতে লাগলেন জিনিষটাকে। সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি আটকে রইলো বস্তুটার ওপর। আনুমানিক পাঁচ-ছয় সেন্টিমিটার চওড়া আর দশ-এগারো সেন্টিমিটার লম্বা, উজ্জ্বল সাদা রং-এর পাত একটা, সম্ভবতঃ প্লাস্টিক্ জাতীয় কোন পদার্থে তৈরী। তার ওপর উজ্জ্বল নীল রং-এর কতকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন আছে। মনে হয় সেগুলি যেন কোন অপরিচিত ভাষার অক্ষর। পোপোকভ আর তাঁর সঙ্গীরা সেই চিহ্নগুলোর কোন মানে খুঁজে পেলেন না। পোপোকভ হাতের পাথর এক পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, “ঢিপির পাথরগুলো সরাও তো, ভেতরে কি আছে দেখা যাক।” অল্প সময়ের মধ্যে পাথরগুলো সরিয়ে ফেলতে দেখা গেল ঢিপির মাঝামাঝি জায়গায় মাটির ওপর একটি বর্গাকার সাদা রং-এর পাত পড়ে আছে। ঢিপির ওপরের

পাতটা যে উপাদানে তৈরী এটিও বোধ হয় তাই দিয়ে তৈরী। সেই পাতটাকে সরিয়ে দিতেই মাটির ওপর তিরিশ চল্লিশ সেণ্টিমিটার গভীর আর পঁয়তাল্লিশ -পঞ্চাশ সেণ্টিমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট একটা গর্ত বেরিয়ে পড়লো। সেই গর্তের মধ্যে রয়েছে কতকগুলো বিচিত্র বস্তু। পোপোকভ ঝুঁকে পড়ে সেগুলিকে বের করে আনলেন। একটা সোনালী রং-য়ের প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থে তৈরী গোল কৌটা, একটা তামাটে রং-য়ের ধাতুর তৈরী পাত আর সিনেমার শ্লাইডের মত দেখতে ছুটো পাত ; এ ছাড়া আর কিছু ছিল না গর্তের মধ্যে।

ধাতুর পাতের একদিকে একটা কাল রংএর ক্ষুদ্র কৌটা লাগানো আছে। তার ওপর সেই অপরিচিত ভাষার কতকগুলো অক্ষর রয়েছে। ধাতুর পাতের আয়তন বেশী নয়, অনায়াসে পকেটে করে নিয়ে যাওয়া চলে। আর স্লাইড্ ছু'টোর ওপর কোন লেখা বা ছবি ছিল না। একটু চেষ্টা করতেই নীল রং-এর কৌটাটা খুলে গেল। ভেতরে পাওয়া গেল কাল রং-এর কিছু ছাইএর মতো পদার্থ।

পোপোকভ আর তাঁর সঙ্গীরা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন। জিনিষগুলি কি তাঁরা কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারবেন কেমন করে? এমন জিনিষ তাঁরা কেউ কস্মিনকালেও দেখেননি। সবাই মিলে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েও কেউ কোন হদিশ পেলেন না।

পোপোকভ তাঁর সযত্নে লালিত গোঁফ জোড়ার ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, "ব্যাপার কি ক্যাপ্‌টেন কুলিক, আমরা সব জেগে আছি তো? আমার তো মনে হচ্ছে আমরা যেন স্বপ্নে কোন রূপকথার দেশে এসে পৌঁচেছি।"

ক্যাপ্‌টেন কুলিক তাঁর চকচকে টাকটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমারও তো তাই মনে হচ্ছে স্যার্! কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে ব্যাপারটা আদৌ স্বপ্ন নয়, একেবারে রূঢ় বাস্তব। কিন্তু……!"

শেষ হ'ল না ক্যাপ্‌টেন কুলিকের কথা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিকট আওয়াজে সবাই দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন। গোড়ার দিকে

যে রেডিওর মত বাক্সটা পাওয়া গেছলো হঠাৎ তার ভেতর থেকে একটা কান ফাটানো আওয়াজ বেরোতে লাগলো। কম্যাণ্ডারের আদেশে যে সৈন্য সেই বাক্স ধরে ছিল আচমকা বিকট আওয়াজে বেচারা এমন চমকে উঠলো যে তার হাত থেকে বাকস পড়ে গেল মাটিতে কিন্তু পড়লেও বিকট আওয়াজটা থামলো না। শব্দটা এত প্রচণ্ড যে সকলেই তার আক্রমণ থেকে নিজেদের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি বাঁচাবার জন্যে কানে আঙ্গুল দিয়ে দূরে সরে যেতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই সেই বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ থেমে গেল।

পোপোকভ আর তাঁর সঙ্গীদের মানসিক অবস্থা হয়ে উঠলো অবর্ণনীয়! এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চমকে তাঁদের চিন্তাশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। সেই বিদ্‌ঘুটে জানোয়ারটার দেখা পাওয়ার পর থেকে এই রহস্যময় বিকট আওয়াজ হওয়া পর্যন্ত যেসব ঘটনা একের পর এক ঘটে গেছে তা' যেমন রহস্যময় তেমনি অকল্পনীয়।

কিছুটা আত্মস্থ হয়ে পোপোকভ ক্যাপটেন কুলিককে বললেন "ত্যাখো ক্যাপটেন, আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমরা এক সাংঘাতিক রহস্যের সম্মুখীন হয়েছি। আর সত্যি কথা বলতে কি এই রহস্যের সমাধান করা আমাদের কর্ম নয়। আমাদের দেশে তুখোড় বিজ্ঞানী অনেক আছেন। এই রহস্যের ওপর আলোকপাত করা যদি সম্ভব হয় তাহলে তাঁদের দ্বারাই তা' হবে। তাছাড়া যে ভয়ঙ্কর জন্তুটার সংগে মোকাবিলা করতে আমরা এখানে এসেছিলাম সেই জন্তুটাই যখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে তখন আমাদের আর এখানে থাকার প্রয়োজন দেখছি না। অতএব যে জিনিষগুলো আমরা এখানে পেলাম সেগুলো নিয়ে আমরা ফিরে যাই এবং কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলো দাখিল করি। তাঁরা যা' ভাল হয় করবেন। তোমার কি মত ক্যাপটেন, বল ?"

ক্যাপটেন কুলিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁর মসৃণ টাকটার

মাথায় হাত বুলোতে থাকলেন (কোন কিছু চিন্তা করার সময় তিনি তাঁর টাকে হাত বোলান, এটা তাঁর মুদ্রা দোষ), তারপর বললেন, "আপনি যা' বললেন স্যার তা' সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থনযোগ্য। এখানে আর আমাদের থাকার কোন মানে হয় না। একটার পর একটা যে রকম অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে, আমাদের চারপাশে যে রকমভাবে রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে তা'তে আমাদের অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে রাইফেল, মেসিন্-গান্, বোমা ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধ করতেই আমরা জানি এবং আমার মনে হয় আমরা তা' ভাল রকমই জানি কিন্তু এসব ভূতুড়ে ব্যাপারের কিনারা করা আমাদের কর্ম নয়। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করা উচিৎ। বাপ্স্ কি বিদ্ঘুটে আওয়াজ-টাই না হয়েছিল! আমার তো পিলে চমকে গেছলো স্যার্।"

কম্যাণ্ডার পোপোকভ মৃদু হেসে বললেন, "পিলে শুধু তোমার একারই চমকায় নি, বোধ হয় সকলেরই চমকেছিল। যাক্গে যা' হবার হয়ে গেছে এখন চল ফিরে যাওয়া যাক্।"

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত জিনিষগুলি নিয়ে তাঁরা তাঁদের হেলিপ্লেনে আবার চড়ে বসলেন। এরো ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ তুলে হেলিপ্লেন চারটি উড়ে চললো তাদের গন্তব্যস্থান অভিমুখে।

[৬]

ডিসেম্বর মাসের শেষ। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। মারাত্মক রকমের ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়ে দিচ্ছে। আল্মা-আটার আর্মি হেড-কোয়ার্টারে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে বেরিয়ে কম্যাণ্ডার পোপোকভ এই বিশ্রীরকমের আবহাওয়াটার উদ্দেশ্যে একটা বিশ্রীরকমের গালি পাড়লেন। তাঁকে এক্ষুনি একবার বিজ্ঞানী ভ্যালেরিয়ান বাজানফের কাছে যেতে হবে। কারণ তিনি সেই ভয়ঙ্কর

জানোয়ারটার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে যে সব অজ্ঞাত পরিচয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, মস্কোর কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে সেগুলির স্বরূপ নির্ণয় করার জন্যে বিজ্ঞানী বাজানফ্‌কে দিয়ে এসেছিলেন।

কিছুক্ষণ আগে পোপোকভকে বাজানফ্‌ টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোনে বিজ্ঞানী অবশ্য বেশীকিছু বলেন নি কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠ-স্বরে যে ক'টি কথা বলেছিলেন তা পোপোকভকে রীতিমত চঞ্চল করে তুলেছিল। বিজ্ঞানী ফোনে বলেছিলেন, "কম্যাণ্ডার পোপোকভ! আপনি যে অবস্থায় থাকুন অবিলম্বে আমার এখানে চলে আসুন। বিশেষ জরুরী দরকার।" এইটুকু বলেই বাজানফ্‌ ফোন ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। সুতরাং পোপোকভ কিছু প্রশ্ন করবার সুযোগ পাননি। রাত তখন প্রায় ন'টা। তিনি এক কাপ ধূমায়মান কফি পান করে এবং সাইরেবিয়ার প্রচণ্ড শীতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে উপযুক্ত গরম পোষাক পরে তাঁর মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাজানফের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। সহরের এক প্রান্তে নির্জ্জন পরিবেশে সেই বাড়ী।

শুক্লাষ্টমীর চাঁদ আকাশে থাকলেও হাল্‌কা কুয়াশার জন্যে জ্যোৎস্না ম্লান। পথে যানবাহন বা পথচারী প্রায় নেই বললেই হয়। তাই পোপোকভের গাড়ী বেশ দ্রুতবেগে চললো গন্তব্যের অভিমুখে। কম্যাণ্ডার মনে উদগ্র কৌতূহল। বাজানফ্‌ এরকভাবে জরুরী তলব কেন করছেন কে জানে? বোধহয় সেই বিচিত্র বস্তুগুলির সম্বন্ধে রীতিমত চাঞ্চল্যকর কোন তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন।

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পোপোকভ অবশেষে বাজানফের বাসগৃহের ফটকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মোটর থেকে নেমে গেট খুলে ঢুকে কলিং বেলের সুইচ্‌ টিপলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। কম্যাণ্ডারকে অভিবাদন জানিয়ে পরিচারিকা তাঁকে নিয়ে দোতলায় উঠলো। বাজানফের ল্যাবরেটরী দোতলায়। একটা কক্ষের সম্মুখে এসে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে পড়লেন। দরজার পাশে একটা সুইচ্‌ টিপতে

অল্পক্ষণ পরে দরজাটি খুলে গেল। পরিচারিকা তখন কম্যাণ্ডারকে ভেতরে যেতে বললো। পোপোকভ উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ-আলোকিত কক্ষটিতে ঢুকে দেখলেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী ল্যাবরেটরীর ওয়ার্কিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিলেন। পোপোকভ ঘরে ঢুকতেই বিজ্ঞানী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "এই যে কম্যাণ্ডার পোপোকভ! আসুন আসুন, আপনার জন্যেই এতক্ষণ হন্যে হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

পোপোকভ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার স্যার, অত জরুরী তলব কেন?"

বাজানফ্ গম্ভীর থম্‌থমে গলায় জবাব দিলেন, "ব্যাপার খুবই গুরুতর। আমার মনে হয় আমাদের পৃথিবীতে অন্যগ্রহের বাসিন্দাদের আগমন হয়েছে।" এরকম কথা শোনবার জন্যে পোপোকভ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রায় চমকে গিয়ে বলে উঠলেন, "বলেন কি স্যার! অন্যগ্রহের অধিবাসীদের আগমন হয়েছে আমাদের এই পৃথিবীতে? আপনার এরকম অনুমানের কারণ কি বলবেন দয়া করে?"

বাজনফ্ বললেন, "দয়া করে আবার কি কথা? আপনাকে সব কথা বলবার জন্যেই তো এখানে ডেকে এনেছি। আপনি যে অদ্ভুত জিনিষগুলি আমাকে দিয়ে গেছলেন সেগুলি বোধ হয় আমাদের পৃথিবীর জিনিষ নয়।"

পোপোকভের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাঁর মুখ প্রায় হাঁ হয়ে এল। তিনি বললেন, "বলেন কি স্যার, ওগুলো এই পৃথিবীর জিনিষ নয়? কি করে বুঝলেন?"

বাজানফ্ "আচ্ছা এদিকে আসুন" বলে পোপোকভকে ওয়ার্কিং টেবিলের কাছে ডেকে আনলেন। টেবিলটির ওপর ছিল কয়েকটি বিচিত্রদর্শন যন্ত্র আর নানা রকম টুকিটাকি জিনিষ। তার মধ্যে থেকে তিনি সেই স্লাইড্ ত্ব'টো বের করে এনে বললেন, "এই যে প্লেট ত্বটি দেখছেন এঁথেকে ত্বটো ছবি পাওয়া গেছে।"

"ছবি ? কিসের ছবি ?" প্রবল কৌতূহলে পোপোকভ জিজ্ঞাসা করলেন।

বাজানফ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "বলছি। তার আগে শুনুন ছবিগুলো দেখলাম কি করে ? ঐ স্লাইড দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গোড়াতেই আমার মনে ধারণা জন্মে ছিল যে বোধ হয় কোন রকম ফটোগ্রাফির পাত। আমার ধারণাটাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বলা যায়। কিন্তু অনেকরকম চেষ্টা করেও পাত দুটো থেকে কোন ছবি 'ডেভেলাপ্' করা গেল না। হাল ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করেছিলাম হঠাৎ আমার মনে হলো বিজ্ঞানী ইয়েভ্‌সাই গোল্ডোভ্‌স্কীর কথা। তিনি আশ্চর্য ফটোগ্রাফিক্ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেক্‌ট্রো-ফটোগ্রাফি।' তার অনেকগুলো সুবিধে আছে। একটা পাত থেকে অনেকগুলো ছবি ওঠানো যেতে পারে তার খুব তাড়াতাড়ি। হাইপো ইত্যাদি কোনরকম রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করবার দরকার হয় না। তা ছাড়া তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা ওই পাতের ছবির কোন ক্ষতি হয় না। ফটোগ্রাফির খরচ অবিশ্বাস্য রকমে কমে যাবে ওই ব্যবস্থাতে। ওর সুবিধে সব থেকে বোঝা যাবে চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজে । একই রীল বার বার ব্যবহার করার ফলে প্রযোজনার খরচ অনেক কমে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে ওই নিয়মের যথেষ্ট প্রচলন হবে বলে আমার বিশ্বাস। যাক্ সে কথা। আসল কথা যা বলছিলাম শুনুন। গোল্ডোভ্‌স্কীর সংগে ফোনে আলোচনা করে তাঁর কথা মত পাত দু'টো নিয়ে আবার টেষ্ট চালাতে লাগলাম। অবশেষে সফল হ'ল আমার প্রচেষ্টা। ওই পাত দুটো থেকে দুটো ছবি পেয়েছি। এই দেখুন সেই ছবি দু'টো।"

বাজানফ্ একটা দেরাজ থেকে দুটো ফটো বের করে পোপোকভের হাতে দিলেন।

প্রবল কৌতূহলে পোপোকভ ঝুঁকে পড়লেন ফটোগুলোর ওপর। একটা ফটোতে দেখা গেল একটা পাহাড়ের ধারে বিরাট আকারের অৰ্দ্ধডিম্বাকৃতি একটি বস্তু আর তার সামনে পনের-কুড়ি জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলোর পরনে অদ্ভুত পোষাক। ফটোটার আয়তনের অনুপাতে মানুষগুলির ছবি খুব ছোট হওয়ায় কারো মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে তাদের পোষাকের বৈশিষ্ট্য সহজে নজরে পড়ে।

অন্য ফটোটাতে আছে পৃথিবীর ছবি। উজ্জ্বল, নিখুঁত ছবি। যেন দূর মহাকাশ থেকে তোলা হয়েছে শক্তিশালী ক্যামেরায়। বিভিন্ন মহাদেশগুলো ফটোটাতে উঠেছে পরিষ্কারভাবে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফটোগুলোকে দেখে পোপোকভ বললেন, "কিন্তু স্যার্ এগুলো থেকে কি করে বোঝা যাবে যে অন্য গ্রহের বাসিন্দা এসেছে আমাদের পৃথিবীতে ?"

বাজানফ মৃদু হেসে বললেন, "এই ছবি দুটো থেকে অবশ্য এমন কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা চলে না। কিন্তু একটু অনুমানের আশ্রয় গ্রহন করলে কি হয় আলোচনা করা যাক। মনে করুন ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দারা আমাদের পৃথিবীতে পদার্পণ করবার আগে দূর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ফটো তুলেছে। এই দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে সেই ফটো আর প্রথমে আপনাকে যে ছবিটা দেখতে দিলাম মনে করুন সেই ছবি ওরা তুলেছে পৃথিবীতে নেমে আসবার পর। এই অৰ্দ্ধডিম্বাকৃতি বস্তুটা সম্ভবতঃ ওদের মহাকাশযান যার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা নিজেদের 'গ্রুপ-ফটো' তুলেছে। তাছাড়া ওদের পোষাকের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুণ। পৃথিবীর কোন দেশের লোক এরকম পোষাক পরে বলে আমার জানা নেই। তা'হলে আমার অনুমানের পথ ধরে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে অন্য গ্রহের অধিবাসিরা আমাদের পৃথিবীতে এসেছে ?"

পোপোকভ মৃদু হেসে বললেন, "আপনার অনুমান খুব চমৎকার

সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অন্য জগতের লোক এসেছে আমাদের পৃথিবীতে?

বাজানফের মুখে একটা রহস্যময় হাসি খেলে গেল। তিনি ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, "প্রিয় বন্ধু, শুধু অনুমান নয় কিছু প্রমাণও আমার হস্তগত হয়েছে।"

"প্রমাণ? কিসের প্রমাণ?" পোপোকভ জিজ্ঞাসা করলেন। বাজানফ এবার কোন জবাব না দিয়ে তাঁর ওয়ার্কিং টেবিলের একধার থেকে সেই বিচিত্র দর্শন 'গ্রীল্' দেওয়া বাকসটা পোপোকভের সামনে নামিয়ে রাখলেন। তারপর বলতে লাগলেন, "এই যে ছোট বাকস আপনারা এনেছেন এটা অসাধারণ, বুঝলেন, ক্যাপ্টেন পোপোকভ?" ক্যাপ্টেন কৌতূহলী হয়ে বললেন, "অসাধারণ কিরকম?"

বিজ্ঞানী জবাব দিলেন, "এটি অসাধারণ এই হিসেবে যে এটি একাধারে শক্তিশালী রেডিও-ট্রান্স্মিটার ও রিসিভার।"

"বলেন কি স্যার্ ট্রান্স্মিটার? কি করে বুঝলেন?" বাজানফ্ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "বাক্সটা নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছিলাম। খুলে ফেলে ভেতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারলাম না। দেখছেন তো একটা অদ্ভুত শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরী হয়েছে। গায়ে কোথাও কোন জোড়, বা রিভেট নেই। যেন ঢালাই করে তৈরী হয়েছে বাক্সটা। স্ক্রু-ড্রাইভার, ছেনি, হাতুড়ি, লোহাকাটা-করাত, তুরপুন ইত্যাদি দিয়ে কোনরকমে খুলতে সক্ষম হলাম না। তখন ঠিক করলাম 'ওয়েল্ডিং ফ্লেম্' দিয়ে ওটার আবরণ গলিয়ে দেখবো ভেতরে কি আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওয়েল্ডিং ফ্লেমও হার মানলো। ওর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারলাম না। অর্থাৎ ওটা এমন একটা ধাতু দিয়ে তৈরী যা' ওয়েল্ডিং ফ্লেমের প্রচণ্ড

উত্তাপে গলে না। বেশ বোকা বনে গিয়ে চুপচাপ বসে বসে ভাবছি অতঃপর এটাকে নিয়ে কি করা যায়। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো। ওর ভেতর থেকে হঠাৎ একটা মৃদু গুন্ গুন্ আওয়াজ বেরোতে লাগলো। আমি তখন রীতিমত চমকে গেলাম। গুন গুন্ শব্দ কিছুক্ষণ হবার পর হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ভেতর থেকে পরিষ্কার রাশিয়ান ভাষায় শুনতে পেলাম, "প্রিয় বন্ধু, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমরা আপনাদের জগতে এসেছি আপনাদের সৌরজগতের বাইরে অন্য এক সৌরজগৎ থেকে। দয়া করে এই দরকারী যন্ত্র ভাঙবার বা নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না। কারণ এটা ভবিষ্যতে আমাদের উভয়েরই খুব কাজে লাগবে। আমরা কোটি কোটি মাইল মহাকাশে দৌড়ে কেন যে এ পৃথিবীতে এসেছি সেকথা যথা সময়ে জানবেন। তার আগে আপনার কাছে আমাদের একটা আবেদন আছে। আমরা এক মহৎ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে অনেক শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি। আপনি একজন বিজ্ঞানী সেজন্য আশা করি আমাদের কাজে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা পাবো।" আমি তো তখন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলাম। আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি? আমার নিজের কান-কেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আমি কি কথাগুলো সত্যিই শুনলাম, সবটাই আমার মনের ভ্রম? যাইহোক্ কোনরকমে সামলে নিয়ে জবাব দিলাম, "আপনারা যে সত্যি অন্যজগৎ থেকে এসেছেন তার প্রমাণ কি? তাছাড়া আপনাদের সংগে চাক্ষুষ পরিচয় না হ'লে কি করে সাহায্য করবো? আপনারা কোথা থেকে কথা বলছেন? কোন জগৎ থেকে এসেছেন আপনারা?" আমার কথা থামতেই যন্ত্রটার ভেতর থেকে একটা উচ্চহাসির শব্দ পেলাম। হাসি থামতেই আবার শোনা গেল, "ধীরে বন্ধু! ধীরে, একসংগে এতগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরে আমাদের কাবু করবেন না দয়া করে। আপনার সব প্রশ্নেরই জবাব

যথাসময়ে পাবেন এবং তখন প্রমাণও পাবেন যে আমরা সত্যিই মহাকাশের আগন্তুক। আপাততঃ দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করুন।" আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি সাহায্য করবো বলুন ?" তখন যন্ত্রটার ভেতর থেকে শোনা গেল, "আপনি আপনাদের গভর্মেণ্টকে বলুন তাঁরা যেন আগামী আঠারোই ডিসেম্বর আপনাদের রাষ্ট্রপুঞ্জের এক জরুরী অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। ঐ অধিবেশনে আমাদের বক্তব্য পেশ করবো আপনাদের পৃথিবীর মানুষদের কাছে।" আমি তখন বললাম, "আপনারা যেই হোন্ একটা জিনিষ ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের গভর্মেণ্টকে কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে, কিসের জোরে এরকম গুরুতর অনুরোধ করবো ? আমি যদি বলি অন্যজগতের অধিবাসীরা আমাদের পৃথিবীতে এসে আমার মাধ্যমে এরকম অনুরোধ করছেন তা'হলে গভর্মেণ্ট কি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন না ? খালি একটা যন্ত্রের কারসাজিতে যদি আমি বিশ্বাস করে বসি যে ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দারা এসেছেন আমাদের পৃথিবীতে তা'হলে আমার সেই বিশ্বাস বড্ড বেশী দুঃসাহসী হয় না কি ? এমন কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাইনি যা'তে নিঃসন্দেহ হতে পারি যে আপনারা সত্যি অন্য জগৎ থেকে এসেছেন।" যন্ত্রের ভেতর থেকে জবাব এল, "সদ্য একটা প্রমাণ চান ? বেশ, প্রমাণ দিচ্ছি। তার আগে আপনার কোন নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে আপনার এখানে আহ্বান করুন। শুধু একজন, বেশী লোক নয়। তাঁর এবং আপনার সম্মুখেই আমরা প্রমাণ দেবো যে আমরা আপনাদের পৃথিবীর অধিবাসী নই। আপনি অবিলম্বে সেই বন্ধুকে ডাকুন। ভালো কথা আপনার নামটি কি দয়া করে জানাবেন ? আলাপের সুবিধে হয় তা'হলে।" আমি জবাব দিলাম, "আমার নাম অ্যালেক্সি বাজানফ্। সংক্ষেপে বাজানফ্ বলতে পারেন।" আমি থামতে যন্ত্রটার ভেতর থেকে শোনা গেল, "ধন্যবাদ, বন্ধু বাজানফ!" তারপর নিঃশব্দ হয়ে গেল যন্ত্রটা আমি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে

যেন একটু বিশ্বাস জন্মে গেছলো। যে সত্যি অন্য জগতের লোক আমাদের পৃথিবীতে এসেছে এবং এতক্ষণ আমি তাদের কথাই এই আশ্চর্য রেডিও মারফৎ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথায় আছে ওরা? তা'হলে কি যেখানে আমাদের ভূ-তাত্ত্বিক অভিযাত্রীদল প্রস্‌পেক্‌টিংএর কাজে গেছলো তারই অনতিদূরে ওরা অবতরণ করেছে আমাদের পৃথিবীতে? যাই হোক ভাবনা চিন্তার কোন কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করলাম যে আপনাকে ডাকি আমার এখানে। ওরা কি প্রমাণ দাখিল করে সেটা দেখবারও লোভ হচ্ছিলো খুব। আপনার কথাই মনে পড়লো সব থেকে আগে। কারণ আপনার মারফৎ এই রহস্যময় জিনিষগুলি আমার কাছে পৌঁচেছে। বুঝলেন ক্যাপটেন! এইজন্যে আপনাকে এতো জরুরী তলব করে ডেকে এনেছি।"

বাজানফ থামতে পোপোকভ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনি তো ভারী আশ্চর্য কাণ্ড শোনালেন স্যার্! আপনার বিবরণ শুনে মনে হয় সত্যি বোধ হয় মহাকাশ পারের আগন্তুকরা এসেছে আমাদের জগতে। ঠিকই বলেছেন আপনি। আমাদের প্রস্‌পেক্‌টিংএর অভিযাত্রীরা যেখানে ক্যাম্প করেছিলেন তার কাছাকাছি বোধ হয় ওরা নেমেছে। আর সে ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা বোধ হয় ওদেরই পোষা কোন জানোয়ার হতে পারে।" বাজানফ বললেন, "তা' হওয়া অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব অভিযাত্রীদের···!"

তাঁর কথা আর শেষ হতে পেল না। হঠাৎ সেই আশ্চর্য রেডিওটা থেকে একটা তীব্র গুন্ গুন্ আওয়াজ বেরোতে তিনি থেমে গেলেন। পোপোকভও সচকিত হয়ে উঠলেন। দুইজনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যন্ত্রটার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরে থেমে গেল গুন গুন্ আওয়াজটা। তারপরেই শোনা গেল এই কথাগুলো, "হ্যালো বিজ্ঞানী বাজানফ, আশা করি আপনার বন্ধু এতক্ষণে এসে গেছেন।

কেমন; তাই না ?”

বাজানফ জবাব দিলেন, “হ্যাঁ আমার বন্ধু ক্যাপটেন পোপোকভ এখন এখানে এসেছেন। আপনারা যে প্রমাণের কথা বলেছিলেন এবার তা দাখিল করতে পারেন। আপনাদের প্রমাণের জন্য আমাদের খুব আগ্রহ হচ্ছে।”

যন্ত্র থেকে শোনা গেল, “ধন্যবাদ ক্যাপটেন পোপোকভ ! আপনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের বিজ্ঞানী বন্ধু বাজানফের কাছ থেকে আপনি আমাদের খবর এতক্ষণে পেয়েছেন নিশ্চয়। তবে সম্ভবতঃ আপনারা আমাদের পরিচয় বিশ্বাস করেন নি। খুব স্বাভাবিক আপনাদের এই অবিশ্বাস। যাই হোক অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সশরীরে উপস্থিত হচ্ছি আপনাদের সম্মুখে। বন্ধু বাজানফ, আপনার বাড়ীর পেছনে যে বাগানটা আছে দয়া করে আপনারা তুজনে সেখানে চলুন। ঐখানেই আমাদের দেখা হবে।”

বাজানফ আর পোপোকভ তুজনেই খুব অবাক হলেন। খুব পরিচিত না হলে বাজানফের বাড়ীর পেছনের বাগাটার কথা কারো জানবার কথা নয়। ওরা যদি সত্যিই অন্য গ্রহ থেকে এসে থাকে তা'হলেও বিজ্ঞানীর বাড়ীর পরিবেশটা নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গভাবে জেনে ফেলেছে এতক্ষণে। নাকি সবটাই একটা বিরাট ধাপ্পা ? এই পৃথিবীরই কোন মতলব-বাজদের কারসাজি ?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে বাজানফ শেষটায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “আমার বাগানটার খবর আপনারা জানলেন কেমন করে ? আপনারা তো কখনও আসেন নি এখানে ?”

রহস্যময় যন্ত্রটা থেকে জবাব শোনা গেল, “কখনও না এলেও এখন এখন এসে গেছি।”

—“এসে গেছেন ? কোথায় ? বাগানে ?”

—“না, ঠিক বাগানে নয়, তবে বাগানের ওপরে।”

—“বাগানের ওপরে ? মানে ?”

মৃদু হাসির শব্দের সংগে শোনা গেল, "মানে জানতে পারবেন। শীগগীর আসুন না বাগানে।"

এর পর আর দেরী করা চলে না। দম-আটকে-আসা কৌতূহল নিয়ে বাজানফ আর পোপোকভ নেমে এলেন বাগানে। বিজ্ঞানীর বাগানের খুব সখ। যত্ন করে অনেক রকম ফল-ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। আয়তনেও বেশ বড় বাগানটা। বাড়ীটা একপ্রান্তে হওয়ায় বাগানটার চৌহদ্দী সম্পূর্ণ নির্জন। ধারে কাছে আর কোন বাড়ী নেই।

এঁরা দুজন তো বাগানে এসে চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখলেন। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করলেন কিন্তু কই কাউকে তো দেখতে পেলেন না! এখন কুয়াসা অনেকটা ফিকে হওয়ায় জ্যোৎস্না কিছুটা জোরালো হয়েছে। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাগানের গাছগুলি ছাড়া কোন প্রাণী তো চোখে পড়ছে না। মহাকাশযাত্রীরা বলেছিল বাগানের ওপরে তারা আছে একথাটা এঁদের দুজনের খেয়াল ছিল না। বাজানফের হঠাৎ তা'মনে পড়ায় আকাশের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই চমকে গেলেন আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, "মেজর পোপোকভ দেখুন দেখুন, ওপরে তাকিয়ে দেখুন।"

চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য। মাটি থেকে আন্দাজ একশো-দেড়শো মিটার উঁচুতে একটি বিচিত্র-দর্শন জিনিস ভাসমান রয়েছে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে! চাঁদের আলো পড়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে জিনিসটা। আকাশে স্থির নিঃশব্দ হয়ে রয়েছে।

পোপোকভ বাজানফের বাহুতে ঈষৎ চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি আশ্চর্য! ওটা কি?"

বাজানফ জবাব দিলেন, "ওটি বোধ হয় ওদের মহাকাশ জাহাজ।" পোপোকভ বললেন, "তা'হলে সত্যি ওরা এসেছে? অন্য গ্রহের অধিবাসিরা অবশেষে এসেছে আমাদের পৃথিবীতে? আচ্ছা দেখাই যাক কি হয়।"

ওঁরা দুজনে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে নীরব হয়ে তাকিয়ে রইলেন আকাশের সেই অদ্ভুত জিনিসটার দিকে।

[৭]

বাজানফ আর পোপোকভের বিস্মিত, কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝে ধীরে আকাশের সেই জিনিসটা নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগলো মাটির দিকে, প্রপেলার বা জেটের কোনরকম আওয়াজ না তুলে। এঁদের দুজনের কাছে এরকম আকাশযান অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্বও বটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশযানটি স্বচ্ছন্দে নেমে এলো বাগানের একফালি ফাঁকা জায়গায় ওপর। যেখানে এরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিলেন তার থেকে অল্প দূরে। এবার বোঝা গেল জাহাজটি লম্বায় একটি বড় সাইজের মোটর বাসের মত কিন্তু তার গঠন অতি বিচিত্র। অনেকটা দেখতে তীরের ফলার মত। একটি ডিমকে আনুভূমিক রেখে মাটির সংগে সমান্তরাল ভাবে মাঝামাঝি কেটে ফেললে যে রকম আকার হয় প্রায় সেই আকারের (অবশ্য আয়তনে অনেক বড়) একটি জিনিষ মাঝখানে বসানো—খুব সম্ভব ওটি সেই আকাশ-জাহাজের কেবিন। কেবিনটির খানিকটা অংশ কাঁচের মত স্বচ্ছ কোন আবরণ দিয়ে তৈরী। ভেতরে অদ্ভুত রং-এর আলো জ্বলছে। বেশ স্নিগ্ধ, কিছু যেন নীলাভ।

জাহাজটি মাটিতে নেমে স্থির হবার কয়েক সেকেণ্ড পরে সেই ডিম্বাকার কেবিনের একপাশে দরজার মত একটা অংশ খুলে গেল। তারপর কেবিনের ভেতর থেকে মানুষের মত দুটি প্রাণী বেরিয়ে মাটিতে দাঁড়ালো। ওরা বেরিয়ে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটির চারদিকে সেই অদ্ভুত রং-এর আলোর বন্যা বয়ে গেল যেন। সেই আলোতে দেখা গেল প্রাণী দুজন অবিকল পৃথিবীর মানুষের মত। কিন্তু পরণে তাদের বিচিত্র পোষাক। ওরা বোধ হয় বাজানফ আর পোপোকভকে আগে থেকে দেখতে পেয়েছিল। তাই জাহাজ থেকে বেরিয়ে বাগানে দাঁড়িয়েই ওরা আহ্বান জানালো, "আসুন বন্ধুগণ! এখানে আলোতে আসুন।"

কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম, সুরেলা। রেডিওতে যেরকম গম্ভীর ভরাট গলা শোনা গেছলো এদের গলার আওয়াজ তা থেকে অনেক তফাৎ।

বাজানফ আর পোপোকভ দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হলেন। আগন্তুক দুজন পৃথিবীর কায়দায় এঁদের সঙ্গে করমর্দন করে বললো, "পৃথিবীর বন্ধুগণ! রিগেলা গ্রহের অধিবাসীদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

প্রত্যভিবাদন জানিয়ে আমাদের এঁরা কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুক দুজনের দিকে। ওদের শারীরিক গঠন অবিকল পৃথিবীর মানুষের মত। কিন্তু পরণে তাদের বিচিত্র পোষাক। অনেকটা সার্কাসের ট্রাপিজ্ খেলোয়াড়ের মত। উজ্জ্বল সোনালী রং-এর পোষাকের ওপর কোমরে গাঢ় নীল রং-এর চওড়া বেল্ট লাগানো। বেল্টের মাঝখানে আটকান রয়েছে গোলাকার একটা ঘড়ির মতো জিনিষ; তাতে একটা নবের মতো জিনিস রয়েছে।

দুজনেরই বুকের ওপর একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র আটকানো রয়েছে, মাথার ওপর অনেকটা প্রাচীন গ্রীকদের মত দেখতে ঝক্‌ঝকে রূপালী রং-এর টুপি জাতীয় কিছু। সেই টুপির মাঝখানে ছোট একটা সরু রড লাগানো। পৃথিবীর মহাকাশযাত্রীরা যেরকম 'স্পেশ্-স্যুট্' পরে সেরকম পোষাকের কোনদিক দিয়েই বিন্দুমাত্র মিল নেই। দুজনেরই সুঠাম ছিপছিপে চেহারা। মুখশ্রী অতি সুন্দর, যেন খোদাই করা। আর গায়ের রং সাদা, তাতে একটু তামাটে আভা।

বাজানফ আর পোপোকভের মনে আগন্তুক দুজনের এরকম আগমনে আর চেহারায় প্রথমে যে চমকের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া কিছুটা মন্দীভূত হলে পরে বাজানফ ওদের সংগে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। হাজার হোক বিজ্ঞানী তো! বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যাবে কোথায়?

তিনি বললেন, "আপনারা যেই হোন আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনারা কি সত্যি আমাদের সৌরজগতের বাইরে অন্য সৌরজগৎ থেকে এসেছেন?"

আগন্তুকদের একজন জবাব দিল, "আপনার কি এখনো সন্দেহ আছে না কি ?"

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বাজানফ বললেন, "না ঠিক সন্দেহ নয় তবে সত্যি বলতে কি এখনো নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।"

তাঁর কথা শুনে আগন্তুক দুজন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। হাসিটা অনেক বেশী মিষ্টি, কিরকম যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে। সেই উচ্ছল হাসিতে বাজানফ আর পোপোকভ দুজনেই একটু বিপর্যস্ত হলেন।

হাসি থামিয়ে এবার অন্য আগন্তুক বললো, "আচ্ছা বিজ্ঞানী আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। যে রকম আকাশযানে চড়ে আমরা আপনার বাগানে এসেছি সেরকম কোন যান আপনাদের পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে কি ?"

বিজ্ঞানী জবাব দিলেন আম্‌তা করে, "না—মানে—ইয়ে—এখনো পর্যন্ত অবশ্য এরকম কোন যান পৃথিবীতে তৈরী হয়নি তবে··· ।"

আবার মিষ্টি হেসে আগন্তুক বললো, "এখনো তবে ? আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন। আপনাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অভিকর্ষকে আয়ত্ত করে ইচ্ছামত কাজ লাগানোর বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন বলুন তো ? অভিকর্ষ এড়াবার কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে কি আপনাদের পৃথিবীতে ?

বাজানফ বললেন, "আপনি ডি-গ্রাভিটেশান্ বা লেভিটেশানের কথা জিজ্ঞাসা করছেন তো ? স্বীকার করতে লজ্জা নেই সামান্য কয়েটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া এখন আমরা বেশী এগোতে পারিনি এই বিষয়ে। একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?"

—জিজ্ঞাসা করেছি এই জন্য যে এই বিষয়ে আমরা কতদূর এগিয়েছি তার একটা পরীক্ষা দেখাতে চাই আপনাদেরকে। আমার এবং আমার সঙ্গীর বুকের ওপর যে যন্ত্র আটকানো আছে তার দ্বারা অভিকর্ষের বিপরীত শক্তি সৃষ্টি করে আমরা আমাদের দেহকে ভূপৃষ্ঠ

ছাড়িয়ে ইচ্ছামত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি। দেখবেন? দেখুন তবে। আমি একাই পরীক্ষাটি দেখাচ্ছি। আমাদের তুজনের দেখবার দরকার আছে বলে মনে করি না। যাক্, আর ভণিতার কোন প্রয়োজন নেই, দেখুন এবার।"

এই বলে সেই মহাকাশযাত্রী তার বেল্টের মাঝখানে লাগানো নবটাতে একটা মোচড় দিল। অল্পক্ষণ—চার পাঁচ সেকেণ্ড—চুপ করে থেকে তার বুকে আটকানো যন্ত্রটার ওপর যে তুটো নব আছে তার একটা একটুখানি ঘুরিয়ে দিল।

তারপর ঘটলো এক আশ্চর্য কাণ্ড যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকেও দেখবার আশা করা যায় না। সকলের চোখের সামনে সেই মহাকাশযাত্রী শোঁ করে আকাশে উঠে গেল অনেক উঁচুতে। তাকে আর দেখাই গেল না। বাজানফ আর পোপোকভ উর্দ্ধমুখ হয়ে রইলেন কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁদের ঐ অবস্থায় থাকতে হ'ল না। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হুস্ করে মাটিতে নেমে এলো আকাশপারের সেই আগন্তুক। কিন্তু নেমে এসে ক্ষান্ত হ'লো না। আবার তার যন্ত্রে কি কারসাজি করলো যার ফলে সে ধীরে ধীরে মাটি ছাড়িয়ে উঠতে লাগলো এবং মাটি থেকে প্রায় তিন মিটার উঁচুতে উঠে স্থির হয়ে রইলো। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে থেকে আবার সে মাটিতে নেমে এলো। কয়েক পা এগিয়ে বাজানফের মুখোমুখি এসে মিষ্টি হেসে বললো, "দেখলেন তো বিজ্ঞানী, আমরা অভিকর্ষকে কি ভাবে আয়ত্ত করেছি? এই যে যন্ত্র দেখছেন আমার গায়ে লাগানো, তার সাহায্যে অভিকর্ষের বিপরীত শক্তি উৎপন্ন করে ইচ্ছামত বেগে যেতে পারি এবং নিরলম্ব অবস্থায় যে কোন উচ্চতায় স্থির হয়ে থাকতে পারি। আমাদের জাহাজটিকে তো দেখছেন। দেখেছেন তো ওটি কেমন স্থির হয়ে আকাশে ভাসমান ছিল! এখনো পর্যন্ত আপনাদের বিজ্ঞান এমন কিছু করতে পেরেছে কি? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে আমরা যে আপনাদের পৃথিবীর অধিবাসী নই, অন্য জগতের লোক একথাটা বিশ্বাস করতে আর আপনাদের বাধা

থাকা উচিৎ নয়। কেমন, এবার বিশ্বাস করলেন তো যে আমরা অন্য জগতের লোক?"

বাজানফ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "আপনাদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। বুঝতে পারছি আপনারা অন্যজগৎ থেকে এসেছেন আমাদের পৃথিবীতে। তবে আর একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আপনারা আমাদের ভাষায় কথা বলছেন কি করে?"

আবার জল-তরঙ্গের মত মিষ্টি হাসির আওয়াজ তুলে আগন্তুক জবাব দিল, "আমাদের কাজের সুবিধের জন্য আপনাদের ভাষা আমরা শিখে নিয়েছি।"

আকাশপারের যাত্রীদের আগমনের পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত পোপোকভ চুপ করেছিলেন, একটিও কথা বলেন নি। কিন্তু এবার তিনি কথা বললেন, "আমাদের ভাষা শিখে নিয়েছেন? কি করে শিখলেন? আমাদের সংগে তো কোনদিন মেলামেশা করেন নি!

রহস্যময় হাসি হেসে আগন্তুক বললো, "মেলামেশা করেছি বইকি।"

চক্ষু বিস্তারিত করে পোপোকভ বললেন, "বলেন কি? আমাদের সংগে মেলামেশা করেছেন? কোথায়, কখন, কি ভাবে মেলামেশা করেছেন তা' তো বুঝতে পারছি না।"

আবার আগন্তুক যুগলের হাসি সরব হয়ে উঠলো।

পোপোকভের মুখের ওপর হাস্যোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে একজন বললো, "পারবেন ক্যাপ্‌টেন, বুঝতে পারলেন। এই শীতের রাত্রে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা খুব আরামদায়ক হচ্ছে কি? বিজ্ঞানী! আপনার ঘরে আমাদের বসবার আমন্ত্রণ জানাবেন না?"

অপরাধীর মুখ-ভঙ্গী করে বাজানফ বললেন, "সত্যি আমার খুব ত্রুটি হয়ে গেছে। এতক্ষণ আপনাদেরকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে বসানো উচিৎ ছিল। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন ভদ্রমহোদয়গণ!"

আবার দুজন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ক্যাপটেন গোঁফে

তা দিয়ে ভাবলেন, এরা কেমন ধারা মানুষ! একটুতে এমন খিল্ খিল্ করে হাসে! কিন্তু এদের হাসি তো খারাপ লাগছে না। সত্যি বলতে কি বেশ মিষ্টি লাগছে এদের হাসি।

হাসি থামিয়ে একজন অতিথি বললো, "আমরা তো ভদ্রমহোদয় নই। আপনাদের সম্বোধনে ব্যাকরণগত ভুল আছে বিজ্ঞানী!"

এবার কথা বললেন পোপোকভ। তাঁর পুরুষ্টু গোঁফের একটা প্রান্তে সজোরে মোচড় দিয়ে বললেন, "আপনারা ভদ্রমহোদয় নন! কি তবে?"

সেই আগন্তুক জবাব দিল, "আমরা কি তা' বলছি। আগে ঘরে চলুন। আমরা দুজনেই খুব শীতকাতুরে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।"

বিজ্ঞানী বাজানফ অমায়িক লোক তা' তো আমরা জানি। অনুশোচনাভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, "চলুন, চলুন, ঘরে চলুন। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না।"

এই বলে তিনি আগন্তুক দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। পোপোকভ চললেন পেছনে পেছনে যেন মূর্তিমান হেঁয়ালিকে অনুসরণ করে। গোঁফের দুটো প্রান্ত দুহাত দিয়ে মোচড় দিতে দিতে। তাঁর মনে উত্তেজনা বা চিন্তার প্রাবল্য থাকলে দু'হাত দিয়ে গোঁফের দু'দিকে মোচড় দেন, এটা তাঁর মুদ্রাদোষ!

বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বিজ্ঞানীর শীততাপনিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে সকলেই স্বস্তি বোধ করলেন। বাজানফ আগন্তুক দুজনকে খাতির করে চেয়ারে বসালেন। তিনি আর পোপোকভ টেবিলের অপর পার্শ্বে অতিথিদের মুখোমুখি বসলেন। সকলেই আরাম করে আসন গ্রহণ করলে পর পোপোকভ বললেন, "বলুন এবার আপনারা কি? বলেছিলেন আপনারা ভদ্রমহোদয় নন।"

যে আগন্তুক বলেছিল যে বাইরে থেকে ঘরে গিয়ে বলবে তারা কি, সে জবাব দিল, "ভদ্রমহোদয়ের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়? ভদ্রমহোদয়া,

তাই না! আমরাও তাই, বুঝলেন মেজর পোপোকভ!"

পোপোকভ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ইয়ে—মানে—আপনারা পুরুষ নন!"

মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে অতিথি জবাব দিল, "না আমরা পুরুষ নই, দুজনেই নারী। রীতিমতো নারী।"

বাজানফ আর পোপোকভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে আগন্তুকদের গলার আওয়াজ, হাসি আর ভাব ভঙ্গী কেমন ঠেকছিল। কিন্তু এঁরা দু'জন আদৌ সন্দেহ করতে পারেন নি যে দুজন পুরুষ নয়, নারী! তাদের পোষাক আর বুকে পিঠে লাগানো যন্ত্র স্ত্রী-সুলভ দৈহিক গঠন বুঝতে দেয় নি।

ওঁরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আকাশপারের অতিথিদের দিকে। আর তারা এঁদের বোকাবোকা অবাক ভাবে কৌতুকবোধ করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ আগন্তুক দুজন দাঁড়িয়ে তাদের হেলমেট, বেল্ট ও যন্ত্র গা থেকে খুলতে লাগলো। হেলমেট খুলতেই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের রাশ বেরিয়ে পড়লো। তারপর বুকের ওপর লাগানো যন্ত্র খুলে ফেলতেই নারী দেহের গঠন প্রকট হয়ে পড়লো বস্ত্রের নীচে লুক্কায়িত পীনোন্নত স্তন যুগলের মহিমায়। তারপর ওরা দুজনেই যখন তাদের পোষাক খুলে ফেলবার উপক্রম করলো তখন বাজানফ আর পোপোকভ দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁদের বাধা দিয়ে আকাশপারের নারীদের একজন বললো, "আপনাদের লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বিবস্ত্রা হচ্ছি না। এই পোষাকের নীচে আরো পোষাক আছে।"

দেখা গেল সত্যি তাই। তাদের বিচিত্র 'স্পেশ-স্যুট' খুলে ফেলতেই উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোষাক বেরিয়ে পড়লো। পাশ্চাত্য নারীরা

বিয়ের সময় যেরকম গাউন পরে অনেকটা সেই রকম। গায়ে অতি সুন্দর নক্‌সা করা ব্লাউশের মতো অঙ্গাবরণ। নানা মনোমুগ্ধকর রঙএর রঞ্জিত পোযাকগুলি যে কি দিয়ে তৈরী তা' বোঝা গেল না। কিন্তু তাদের একটা বৈশিষ্ট্য বাজানফ আর পোপোকভের নজর এড়ানো। পোষাকগুলি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে একটা স্নিগ্ধ আশ্চর্য জ্যোতি! যেন নানা রংএর আলো মাখানো রয়েছে সেগুলিতে। এমন আশ্চর্য পোষাক এঁরা কোনদিন দেখেন নি।

মহাকাশযাত্রিনী দুজনেরই দুহাতের কব্জিতে শোভা পেয়েছে বালার মতো বিচিত্র অলংকার আর গলায় রয়েছে নেকলেস্। দুজনেরই মাথায় চুলের ওপর করোনেট (মুকুট জাতীয় অলঙ্কার) আটকানো সেই করোনেটের মাঝখানে রয়েছে উজ্জ্বল নীল আলো বিকীরণকারী গোলাকার একটি বস্তু, সম্ভবতঃ কোন মূল্যবান রত্ন। দুজনেরই চুলের রং কালো তাতে যেন একটু নীলের আভা। সে এক আশ্চর্য চুল!

বিস্ময়কর সুন্দর পোষাক, অলঙ্কার ও অসামান্য দৈহিক সৌন্দর্য মিলে রূপায়িতা করেছে যেন কল্পলোকের দুই পরীকে! এমন অতুলনীয়া রূপসী নারী পৃথিবীতে আছে কিনা তা' বাজানফ আর পোপাকভের জানা নেই। হয়তো থাকতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই অতি বিরল। এই কল্পলোকের রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো একটা জিনিষ। উভয়েরই পোযাক এবং চুল থেকে এমন একটা অপার্থিব অপূর্ব সুরভি নির্গত হচ্ছে যা আবিষ্ট করে দেয় মনকে। মোটকথা সব মিলিয়ে অপূর্ব মোহিনী নারী মূর্তি, যা পুরুষের মনে জাগায় দারুণ আলোড়ন, উন্মাদ করে তোলে রূপাবিষ্ট পুরুষকে।

এই পরীদের দেখে শ্রদ্ধেয় প্রৌঢ় বিজ্ঞানী বাজানফের মনে কি ভাবের উদয় হোল তা' বোঝবার ধৃষ্টতা আমাদের না হওয়া উচিৎ কিন্তু অমন যে কড়া মিলিটারী অফিসার পোপোকভ, তিনি যে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তা' তাঁর বিস্ফারিত চক্ষু আর হাঁ-হয়ে-আসা মুখ থেকে বোঝা গেল। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস

গোঁফে তা' দিতে ভুলে গেলেন তিনি। বোধহয় ভাবছিলেন, আহা, তাঁদের দেশে যদি এমন সুন্দরী মেয়ে থাকতো! তাঁর মনে হোল তাঁদের দেশের বেশীর ভাগ মেয়েই কি হোঁৎকা আর কাঠখোট্টা চেহারার! তার ওপর তাঁর নিজের স্থূলাঙ্গী সাদামাটা চেহারার স্ত্রীটিকে স্মরণ করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

[৮]

রাশভারী বিজ্ঞানী বাজানফ এতক্ষণ প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন, "আপনারা আমাদের খুব অবাক করে দিয়েছেন ম্যাডাম। আপনাদের মহাকাশ-যানের আগমন থেকে আরম্ভ করে নারী মূর্তিতে আপনাদের প্রকাশ—সব কিছুই যেন ইন্দ্রজালের মতো মনে হয়। চোখের সামনে জাগ্রত অবস্থায় যে এরকম অঘটন কোনদিন ঘটতে পারে তা' আমার ধারণার বাইরে। যাই হোক, এবার বলুন কি জন্যে আপনাদের শুভাগমন হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে আর আমরা কি ভাবে আপনাদের নাম জানতে পারলে আলাপের সুবিধে হোত।"

আকাশপারের পরীদের একজন জবাব দিল, "নিশ্চয়ই, আমাদের নাম জানবেন বইকি। আমার নাম রীন-লি-টামেজ, সংক্ষেপে 'রীনি' আর আমার সঙ্গিনীর নাম জুল্-রি-কোমাড সংক্ষেপে 'জুলি'। আপনারা আমাদের রীনি আর জুলি বলেই সম্বোধন করবেন। এবার কাজের কথা বলি শুনুন। আমরা এসেছি আপনাদের সৌরজগতের বাইরে অন্য একটি সৌরজগৎ থেকে। 'ক্যানিস্ মাইনর' নক্ষত্রপুঞ্জে 'প্রোকিয়ন' নামে যে নক্ষত্র আছে তার একটি গ্রহে আমাদের বাস। আপনাদের পৃথিবী থেকে আমাদের গ্রহের দূরত্ব প্রায় এগারো আলোকবর্ষ। আমাদের গ্রহের নাম 'রিগেলা'। অবিশ্যি আজই আমরা সোজা সেখান থেকে আসিনি। আপনাদের পৃথিবীতে

আমাদের যে ঘাঁটি আছে সেখান থেকে আজ এসেছি আপনাদের কাছে।” বাধা দিয়ে পোপোকভ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাদের পৃথিবীতে আপনাদের ঘাঁটি আছে? বলেন কি? কোথায়!”

“আপনাদের মাতৃভূমি রাশিয়াতে,” জুলি জবাব দিল।

ছানাবড়ার মত চোখ করে পোপোকভ বললেন, “অ্যাঁ, বলেন কি! আমাদের রাশিয়াতে আপনাদের ঘাঁটি আছে? কোন জায়গায় বলুন তো?”

—ধীরে, মেজর পোপোকভ, ধীরে। ব্যস্ত হবেন না দয়া করে। যথাসময়ে সব জানতে পারবেন।

পোপোকভের মুখের ওপর আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে বললো জুলি।

রীনি তার কথার সূত্র ধরে ফের বলতে লাগলো, “আপনাদের পৃথিবীর হিসেবে একমাস আগে আমরা এসেছি আপনাদের পৃথিবীতে। আপনাদের দেশে একটা গোপন স্থানে আমাদের ঘাঁটি রয়েছে। আমাদের এখানকার ঘাঁটির সর্বাধিনায়ক তিনি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে আমাদের দুজনকে এখানে পাঠিয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে রেডিওমারফৎ তাঁর কথাই শুনেছিলেন আপনারা।”

আবার বাধা দিলেন পোপোকভ, “আপনাদের এখানকার ঘাঁটিতে আপনাদের মতো সুন্দর মেয়ে আরো আছে না কি?”

একথা শুনে রীনি ও জুলি দুজনে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

জুলি বললো, “আপনাকে হতাশ করছি বলে দুঃখিত, মেজর পোপোকভ! আমাদের এখানকার ক্যাম্পে মেয়ে মাত্র আমরা দুজনই আছি। আমাদের পৃথিবীর নিয়মানুসারে বৈদেশিক-সম্পর্ক সংস্থা (ফরেন রিলেশান্স্ ডিপার্টমেন্ট্) মেয়েদের ওপর ন্যস্ত। আমাদের এখানকার হেড কোয়ার্টারের ফরেন ডিপার্টমেন্টে কর্মী শুধু আমরা দু'জন। আমাদের কাজ হ'ল আমাদের আসার উদ্দেশ্য আপনাদের

পৃথিবীর লোককে বুঝিয়ে আপনাদের সহযোগিতা আদায় করা।"

বিজ্ঞানী বাজানফ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি কথা বললেন, "আপনাদের সব ব্যাপারই অতি আশ্চর্য ম্যাডাম্! আপনারা কখন যে আমাদের পৃথিবীতে এসে ঘাঁটি স্থাপন করেছেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট খুলেছেন তা তো আমরা কিছুই জানতে পারিনি। অথচ আমাদের এতো সব রাডার, রেডিও-টেলিস্কোপ্ আছে! আমরা আমাদের বিজ্ঞানের বড়াই করি!"

মধুর হাস্যে সুন্দর মুখ আলোকিত করে রীনি বললো, "তুলনামূলক বিচারে আপনাদের বিজ্ঞান আমাদের বিজ্ঞানের অনেক, অনেক পেছনে আছে—বলতে গেলে প্রায় প্রাথমিক স্তরে! আপনাদের রাডারে আমাদের মহাকাশযানের ছবি ওঠে না তাই আপনারা আমাদের আগমন জানতে পারেন নি। আমরা একটি বিরাট মহাকাশযান নিয়ে কুড়িজন লোক আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি এবং আপনাদের দেশ রাশিয়াতে এমন এক গোপন স্থানে আমাদের ঘাঁটি করেছি যেখানে পৃথিবীর মানুষের হামলা করবার সম্ভাবনা কম। এখানে ঘাঁটি স্থাপন করে আমাদের প্রাথমিক কাজ হ'ল আপনাদের পৃথিবীর দুটি প্রধান ভাষা শিক্ষা করা। আমাদের আন্তর্গ্রহ ভাষা সমিতির ভাষা সমিতির দায়িত্ব এটি। আমরা পর্যবেক্ষণ করে স্থির করেছিলাম যে ইংরাজী এবং রাশিয়ান এই দুটি ভাষা শিখলেই আমাদের চলবে। এই সিদ্ধান্ত করে ইংল্যাণ্ডে এবং রাশিয়ার আমাদের ক'জন সহকর্মী কাজ করতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষের সংগে বেমালুম মিশে গিয়ে ইলেকট্রনিক্ ব্রেন, টেপ্-রেকর্ডার এবং টেলিপ্যাথির সাহায্যে এই দুটি ভাষা শিখতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষের তুলনায় আমাদের গ্রহের মানুষেরা বিবর্তনের অনেক ধাপ এগিয়ে আছে। তাই আমাদের মস্তিষ্কের শক্তি পৃথিবীর মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশী। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের কর্মীরা এই ভাষা দু'টি নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করে ফেললো। আমাদের প্রজেক্টের নিয়ম

অনুযারী আমাদের ঘাঁটির সকলে আমরা এই দুটি ভাষা শিখে নিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা দু'জনে রাশিয়ান ভাষায় যেমন সুন্দরভাবে কথা বলতে পারছি, ইংরেজি সেরকম পারি।"

এই বলে রীনি চুপ করলো বোধ হয় একটু দম নেওয়ার জন্যে। এদের কথা যতই শুনছিলেন ততই বাজানফ আর পোপোকভের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই চলছিল। সমস্ত ব্যাপারটা যে কল্পনা-বিলাসীর উদ্দাম কল্পনাকেও হার মানায়!

বাজানফ বললেন, "ম্যাডাম! আপনাদের কথা যতই শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। ধন্য আপনারা! মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে আমরা নিতান্ত নাবালক! যাই হোক আপনাদের আসার উদ্দেশ্য শোনাবার আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিলে বাধিত হব। যে জাহাজে চড়ে আপনারা আমার বাগানে এসেছেন তা কিসে চলে?"

রীনি জবাব দিল, "আমাদের এই জাহাজের গতি দুটো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জাহাজকে থেকে উঠানোর বা মাটিতে নামিয়ে আনার ব্যাপারে কাজ করে অ্যান্টি গ্রাভিটি মেশিন। আর জাহাজটা সামনে, পেছনে, বাঁয়ে চলে ফোটন জেটের সাহায্যে।"

উত্তেজনাভরা বাজানফ বললেন, "ফোটন জেট্! যে ফোটন জেট্ এখনো পর্যন্ত আমাদের কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ তা' আপনারা কাজে লাগিয়েছেন! আচ্ছা ম্যাডাম, আপনাদের জাহাজে দুরকম শক্তি ব্যবহার করার অর্থ বোধ হয় জাহাজের গতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনা। তার দ্বারা জাহাজটা বোধ হয় আকাশে যে কোন অবস্থায় স্থির হয়ে থাকতে পারে এবং যে কোন দিকে যে কোন গতিতে যেতে পারে। কেমন আমার ম্যাডাম, অনুমান ঠিক নয়?"

"নিশ্চয়ই ঠিক। আপনি ঠিক ধ'রেছেন"—মৃদু হেসে মন্তব্য করলো রীনি।

বাজানফ আবার প্রশ্ন করলেন, "আমার বাগানে আপনারা

যেরকম জাহাজ নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই এরকম জাহাজে চড়ে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আপনারা আমাদের পৃথিবীতে আসেন নি। আপনাদের তোলা যে ফটোখানা আমি ডেভেলাপ্ করেছি তা'তে দেখেছি একটা বিরাট মহাকাশযানের পাশে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবতঃ ওতে চড়েই আপনারা আমাদের পৃথিবীতে এসেছেন। তাই না?"

রীনি জবাব দিল, "এবারও আপনার অনুমান ঠিক। আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি আমরা একটা বিরাট জাহাজে চড়ে। তবে এখানে বিভিন্নস্থানে যাবার জন্যে ছোট আকারের চারটি জাহাজ নিয়ে এসেছি। আপনার বাগানে যে রকম জাহাজ এনেছি ঐরকম চারখানি জাহাজ। আমাদের ভাষায় এই জাহাজের নাম 'ফ্লিটা'—যার অর্থ সচ্ছন্দগতি'। আর যে জাহাজে চড়ে আমরা আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি তার নাম 'ভোমারগান'। এর অর্থ মহাকাশযান। আমাদের এই মহাকাশযান কিন্তু চালিত হয় শুধুমাত্র ফোটন জেটের সাহায্যে। বিশেষ ধরনের নির্মিত চেম্বারে ম্যাটার এবং অ্যান্টি-ম্যাটারের মিলনে এই ফোটন জেট উৎপন্ন হয়। মহাকাশযানে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে কোটি-কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যেতে হলে একটি মাত্র গতির প্রয়োজন হয়। তা' হ'ল নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে অতি দ্রুতগতি। সেক্ষেত্রে উপরে-নীচে বা ডাইনে বাঁয়ে গতি অনাবশ্যক। কাজেই আমাদের মহাকাশযান চালিত হয় ফোটন জেটের সাহায্যে। এর দ্বারা আমাদের মহাকাশযান সেকেণ্ডে ত্বু'লক্ষ আশি হাজার কিলোমিটার বেগে মহাশূন্য পাড়ি দিতে পারে। অর্থাৎ প্রায় আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি। আপনি তো জানেন আলোকের গতিবেগ অর্জ্জন করা কোন মহাকাশযানের পক্ষে সম্ভব নয়।"

গম্ভীরভাবে বাজানফ বললেন, "না তা' সম্ভব নয়। তবে আমি উপলব্ধি করছি আপনাদের তুলনায় আমরা অনেক, অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। আপনাদের তুলনায় আমরা শুধু নাবালক নই, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু। আপনাদের সব ব্যবস্থা অতি নিখুঁত—বা আমাদের কাছে

চরম বিস্ময়কর।"

প্রবীণ বিজ্ঞানীর এরকম মন্তব্য শুনে গ্রহান্তরের সুন্দরী তরুণী যুগলের মুখচন্দ্রিমা রঞ্জিত হ'ল আত্ম-তৃপ্তির মধুর হাস্যে।

হাস্যাননা জুলি পোপোকভের দিকে চটুল নয়নে কটাক্ষ হেসে হঠাৎ বললো, "মেজর পোপোকভ, আপনারা প্রশ্নের জবাব দিই শুনুন।"

চোখগুলোকে ভেজিটেবল্ চপের মতো বড় করে মেজর পোপোকভ বলে উঠলেন, "আমার প্রশ্ন ? আমি আবার প্রশ্ন করলাম কখন!"

রহস্যময় হাসি হেসে সুন্দরী জুলি জবাব দিল, "আপনার মনে এখন যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে অথচ এখনো যা বাক্যে প্রকাশ করেন নি সেই প্রশ্ন।"

জুলির জবাবে পোপোকভ বাঁ-হাত দিয়ে তাঁর রাজকীয় গোঁফের ডান দিকে মোচড় দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ওঃ বুঝেছি। আপনি থট্-রিডিং করে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। বেশ বলুন তো শুনি আমার মনে এখন কি প্রশ্ন জেগেছে!"

—আপনি ভাবছেন আমাদের মাথায় যে করোনেট রয়েছে তার মাঝখানে দীপ্তিময় গোলাকার ওটা কি! আর আমাদের হাতের গয়নাগুলো কি দিয়ে তৈরী আর এরকম অদ্ভুত দেখতে কেন ? কেমন, তাই না ?

"ভারী আশ্চর্য তো! আমি সত্যি তাই ভাবছিলাম। আপনার ক্ষমতা আছে দেখছি," অকৃত্রিম বিস্ময়ে পোপোকভ জবাব দিলেন।

"শুধু আমার নয় রানিরও এই ক্ষমতা আছে," জুলি বললো, "আমরা সকলে 'টেলিপ্যাথি' জানি। গ্রহান্তর যাত্রায় টেলিপ্যাথি জানা অত্যাবশ্যক। মনে করুন আপনি পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশের পথে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে অন্য একটা গ্রহে পৌঁচেছেন। সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখবেন সেই গ্রহের অধিবাসী, তাদের ভাষা, সেখানকার পরিবেশ সবই আপনার কাছে অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। টেলিপ্যাথি জানা থাকলে তখন তা' আপনার পরম উপকার করবে। আপনি

বুঝতে পারবেন সেখানকার অধিবাসীদের মনের ভাব আর সেই অনুযায়ী তখন আপনার কর্ত্তব্য স্থির করতে পারবেন। আর যদি সেখানকার অধিবাসীরাও টেলিপ্যাথি জানে তা' হলে তো সোনায় সোহাগা। তখন আপনার এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান অবাধে চলতে থাকবে; ভাষার পার্থক্য কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।"

জুলির কথার মাঝখানে মেজর পোপোকভ হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু ম্যাডাম, একটা জিনিষ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যার ভাষা জানি না টেলিপ্যাথির দ্বারা তার মনের ভাব বুঝবো কি করে? আমি তো ইংরেজী জানি না তা' হলে একজন ইংরেজের মনের ভাব বুঝতে পারবো?"

জুলি জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। কারণ মনের চিন্তা মস্তিষ্কের কোষে যে তরঙ্গ উৎপন্ন করে তা' রেডিও-তরঙ্গের মত যখন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে তরঙ্গের তো কোন ভাষা থাকে না। আপনার মস্তিষ্ক সেই চিন্তা তরঙ্গ গ্রহণ করে দোভাষীর মত কাজ করে তার অর্থ জোগাবে আপনার মনে। কাজেই টেলিপ্যাথির পক্ষে ভাষার পার্থক্য কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে।"

বিজ্ঞানী বাজানফ এতক্ষণে কথা বললেন, "টেলিপ্যাথিকে তা' হলে আপনারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন দেখছি। আপনাদের মতে তা' হলে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে! আমি তো এটাকে ম্যাজিকের খেলা বলে মনে করতাম।"

তাঁর কথার এবার জবাব দিল রীনি। বিজ্ঞানীর দিকে তার সুন্দর স্মিত-হাস্যোজ্জ্বল চোখোর দৃষ্টি মেলে বললো, "এটা যে ম্যাজিকের খেলা নয় তা' তো আপনি দেখলেন। তবে? এর সত্যি বৈজ্ঞানিক-ভিত্তি আছে। আপনাদের পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানী তা মানেন। আমরা যতদূর খবর পেয়েছি তা'তে জেনেছি যে আপনাদের পৃথিবীতেও কিছুসংখ্যক মনোবিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (এক্সট্রা-সেনসরি

পারশ্যেপশ্যন, সংক্ষেপে ই এস্ পি) বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। এর ফলে টেলিপ্যাথির ব্যাপক প্রয়োগ এখনো পর্যন্ত আপনাদের পৃথিবীতে না' হলেও ভবিষ্যতে যে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন আপনাদের পৃথিবীর মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি এখনকার তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। বিশাল মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ আছে যেখানে আপনাদের পৃথিবীর মানুষের মতো বা তার চেয়েও বহু গুণে বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে অনেক গ্রহের অধিবাসী এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, মস্তিষ্কের শক্তিতে তারা এত বেশী অগ্রসর হয়েছে যে বেশীর ভাগ সময়ই তারা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালায়। একে নিঃশব্দ সংলাপ বলতে পাবেন। ফুস্‌ফুস্ আর স্বরযন্ত্রের মেহনৎ করে কথা বলার প্রয়োজন হয় না তাদের সেক্ষেত্রে শব্দ করে কথা বলা সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থা বলে গণ্য করা হয়। আমাদের গ্রহে টেলিপ্যাথি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়। শব্দ করে কথা আমরা খুব কমই বলি।"

পোপোকভ আবার গোঁফে তা' দিয়ে বললেন, "অনেক নতুন কথা শোনালেন ম্যাডাম। বুঝলাম আমরা সত্যি এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছি। যাক সে কথা। আপনাদের গয়নার বিষয়ে কি বলবেন বলছিলেন এবার তা' বলুন দয়া করে।"

এর জবাব জুলির কাছ থেকেই পাওয়া গেল।

সে বলতে লাগলো, "আমরা যে সব গয়না পরেছি তা' শুধু আমাদের চেহারা খোলতাই করবার জন্যে নয়। এর অন্য ব্যবহারও আছে। এগুলি গয়না এবং যন্ত্র একাধারে দুই। অর্থাৎ এগুলি গয়না-রূপী যন্ত্র। একটা একটা করে বলছি শুনুন। প্রথমেই দেখুন আমাদের করোনেটের মাঝখানে যে মণির মতো জিনিষটা আছে ওটা কিন্তু মণি নয়, ওটা অমন একটা যন্ত্র যা মানুষকে অসাড় অবশ করে দিতে পারে। দেখবেন? মেজর পোপোকভ একটু এদিক এসে দাঁড়ান তো।"

এই বলে জুলি চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিল থেকে একটু তফাতে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

অমন জাঁদরেল মিলিটারী অফিসার পোপোকভ কিন্তু উঠলেন না। বেশ বোঝা গেল তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। প্রভু যীশু জানেন ঐ যন্ত্রটা দিয়ে কি না জানি হয়ে যেতে পারে তাঁর! এই সুন্দরীদের বিশ্বাস নেই। এরা তাঁকে ভেড়া বানাতে পারে!

তাঁর মনের ভাব টের পেয়ে জুলি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললো, "কোন ভয় নেই মেজর! আসুন না এদিকে।" এই বলে সে পোপোকভকে হাত ধরে উঠিয়ে হিড় হিড় করে টেনে ঘরটার এক কোণে নিয়ে গেল। রূপসী নারীর হাতের স্পর্শে তাঁর শরীরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরণ বয়ে গেল। পোপোকভকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে জুলি খানিকটা তফাতে তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। যে জাঁদরেল সেনানায়কের দাপটে সৈন্যবাহিনী তটস্থ, দৈত্যের মতো চেহারার মিলিটারী অফিসাররাও যাঁর সামনে সমীহ করে কথা বলেন সেই মেজর পোপোকভ জুলির যেন হাতের পুতুল! তিনি সুবোধ বালকের মতো মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জুলি তার করোনেটের মাঝখানের বস্তুটিকে ধরে একটু মোচড় দিয়ে মাত্র পাঁচ-ছ সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ারে এসে বসলো। এদিকে পোপোকভ প্রস্তরমূর্তির মতো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখের পলক পড়ছে না, মুখ ভাবলেশহীন! জুলি চেয়ারে বসে বাজানফের দিকে তাকিয়ে বললো, "মিষ্টার বাজানফ! আপনার বন্ধু, 'প্যারালাইজড্' (অবশ) হয়ে গেছেন। আপনি তাঁকে এখানে ডাকুন তো।"

কিছুটা যেন উৎকণ্ঠা মিশ্রিত সুরে বাজানফ আহ্বান জানালেন। "মেজর পোপোকভ, এখানে আসুন।"

কিন্তু তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে পোপোকভ তেমনি দাঁড়িয়েই থাকলেন অনড় হয়ে।

"মেজর পোপোকভ, শুনছেন ? মেজর পোপোকভ !"

বাজানফ আবার ডাকলেন কিন্তু নড়াচড়া দূরের কথা পোপোকভ সাড়া পর্যন্ত দিলেন না ! কী তাজ্জব !

বাজানফ আর স্থির থাকতে না পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি পোপোকভের কাছে গিয়ে তাঁর দু'কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকান দিয়ে বললেন "পোপোকভ শুনছেন ? কি হয়েছে আপনার ? কথা বলছেন না কেন ?"

কিন্তু কে জবাব দেবে ? পোপোকভ যেন একটা স্ট্যাচু !

মৃদু হেসে জুলি বললো, "বেশী ঝাঁকানি দেবেন না, পড়ে যেতে পারেন। কারণ ওঁর দেহের ওপর এখন আর ওঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই।"

"ওঁর জ্ঞান আছে তো ?" বাজানফ জিজ্ঞাসা করলেন।

জুলি জবাব দিল, "হ্যাঁ, জ্ঞান পুরোমাত্রায় আছে। সবই দেখতে শুনতে পারছেন কিন্তু চোখের পলকটি পর্যন্ত নাড়বার শক্তি নেই ওঁর।"

আবার জিজ্ঞাসা করলেন বাজানফ, "ওঁর এরকম অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হবে ?"

—তা' কমপক্ষে মিনিট পনেরো তো বটেই। তবে অতক্ষণ ওঁকে ঐ অবস্থায় রাখবো না। এক্ষুনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনছি।

—বলেন কি আপনাদের ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রের এতো ক্ষমতা ?

—এটা তেমন কিছু নয়। আমাদের এমন যন্ত্র আছে যার দ্বারা কোন মানুষ বা প্রাণীকে চিরদিনের মতো পঙ্গু, অসাড় করে দিতে পারি।

—আপনার করোনেটের মধ্যের ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটির কি আশ্চর্য শক্তি ! অথচ দেখতে কেমন নিরীহ চেহারা যেন সুন্দর একটি মণি। যন্ত্র বলে মনেই হয় না। ওটা কিভাবে কাজ করে ?

—বলছি, আগে ভদ্রলোককে স্বাভাবিক করে তুলি।

এই বলে জুলি পোপোকভের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার করোনেটের

সেই ক্ষুদ্র অথচ বিস্ময়কর শক্তির আধার যন্ত্রটাতে আর একবার মোচড় দিল আর তারপরই আশ্চর্য কাণ্ড! পোপোকভ হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গা ঝাড়া দিলেন এবং গোঁফে তা' দিতে দিতে চেয়ারে এসে বসলেন। তারপর কি মনে করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জুলিকে একটা মিলিটারী স্যালুট্ দিলেন। দিয়ে বললেন, "ধন্য ম্যাডাম! ধন্য আপনার যন্ত্র! ঐ একরত্তি যন্ত্রটা আমার মতো একটা দৈত্যকে 'ল্যাজে-গোবরে' করে ছেড়েছিল। তবে আপনাদের দুজনের পক্ষে ঐ যন্ত্রটা ব্যবহার করা খুব প্রয়োজন মনে করি না। আপনাদের যা' স্বর্গীয় সৌন্দর্য, পুরুষকে প্যারালাইজড্ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

রাশভারী মেজরের এরূপ রসিকতা ভরা কথায় সকলেই সজোরে হেসে উঠলেন।

বাজানফের কথা স্মরণ করে জুলি বললো, "আমাদের এই প্যারা-লাইজার কি ভাবে কাজ করে জানতে চাইছিলেন, না? এটি এক জাতীয় ট্রান্স্মিটার। অতি সূক্ষ্ম ও জটিল এর ভেতরের যন্ত্রপাতি। এ থেকে খুব সূক্ষ্ম একধরণের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ উৎপন্ন হয় রেডিও-তরঙ্গের মতো। কিন্তু রেডিও তরঙ্গের চেয়ে তা' বহুগুণে সূক্ষ্ম। আপনাদের বিজ্ঞান এখনো এতো সূক্ষ্ম তরঙ্গ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় নি। এই তরঙ্গ যখন কোন মানুষ বা প্রাণীর মস্তিষ্কের ওপর পড়ে তখন তাকে অবশ করে দেয় অথচ তার চৈতন্য লুপ্ত হয় না।"

বাজানফ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের এই প্যারালাইজার ব্যবহার করার সার্থকতা কি?"

"অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা। সুন্দরী নারীদের কতো বিপদ জানেন তো?"

লাজুক হাসি হেসে জবাব দিল জুলি।

"তবে এর থেকেও শক্তিশালী এবং বড় আকারের যন্ত্র আমাদের রয়েছে। আমাদের গ্রহ ছেড়ে অন্য গ্রহে অভিযানের সময় আমরা সেরকম যন্ত্র সংগে নিয়ে যাই। ভিন্ জগতের অধিবাসীরা আমাদের

আক্রমণ করলে আমরা সেই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারি। তা'তে প্রাণহানি না করেও আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়। আমাদের এই বড় যন্ত্রগুলি একসঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ বা অন্য প্রাণীকে প্যারালাইজড করে দিতে পারে।"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বাজানফ বললেন, "ভারী আশ্চর্য তো! আচ্ছা, আত্মরক্ষার জন্যে অন্য কোনরকম অস্ত্র ব্যবহার করেন না আপনারা?

এবার রীনি জবাব দিল, "করি বইকি। আরো সাংঘাতিক অস্ত্র আছে আমাদের। তা' হ'ল 'অ্যান্টি-ম্যাটার গান'। এর দ্বারা হাজার হাজার প্রণীকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। মহাকাশ অভিযানে এই অস্ত্রও আমাদের সংগে থাকে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা তা' ব্যবহার করি না।"

ভীতিমিশ্রিত কণ্ঠে পোপোকভ বললেন, "বলেন কি ম্যাডাম? আপনাদের অ্যান্টি-ম্যাটার গান দিয়ে হাজার হাজার প্রাণীকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন? কী সাংঘাতিক কথা! তা' এরকম হাতিয়ার আমাদের পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন নাকি?"

রীনির মুখে কৌতুকভরা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। সে বললো, "সবরকম হাতিয়ার কিছু কিছু এনেছি বৈ কি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের আনতে হয়। তা'তে আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই কারণ আমাদের পৃথিবীতে এসব অস্ত্র ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। আমাদের গ্রহ থেকে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আরো কয়েকটি গ্রহে আমরা অভিযান করেছি। দেখছি তাদের মধ্যে আপনাদের পৃথিবী দুর্বলতম। বিজ্ঞানে এখন আপনারা যা' করছেন সেই সব গ্রহের অধিবাসীরা কয়েক শ' বছর আগে তা'ই করতো।"

রীনির কথা শুনে বাজানফ পোপোকভের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলেন তো মেজর, ম্যাডাম যে সব কথা বললেন? ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ভেবে দেখুন।"

ঠোঁট উল্টিয়ে পোপোকভ বললেন, "আমি আর ভেবে কি করবো

বলুন। আমি তো আর বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাই না। ঘামাবার মতো সেরকম মাথাই নেই আমার! আপনারা বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামান, আপনারাই ভেবে দেখুন। তবে আমার মনে একটা মহৎ ইচ্ছা উঁকি দিচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীদের ডেকে বলি, বাবা-সকল! তোমরা হ্যানো করেছো, ত্যানো করছো বলে আর বড়াই করো না। তামাম বিশ্বে বিজ্ঞানে তোমরা এখনো দুগ্ধপোষ্য শিশু, দাঁত ওঠেনি। বেশী লাফঝাঁফ দিও না বাছাধনেরা!"

পোপোকভের কথায় সকলের উচ্চ হাসিতে আবার ধ্বনিত হয়ে উঠলো ঘরখানা।

হাস্য স্রোত একটু স্তিমিত হলে পর পোপোকভ আবার বললেন, "ভালো কথা ম্যাডাম, আপনাদের অন্য গয়নাগুলো কি তা' তো বললেন না। তবে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয় না। আবার কি শুনবো, কি দেখবো মা মেরী জানেন।"

আবার হাসির কলরোল উঠলো।

হাসতে হাসতে রীনি বললো, "আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, মেজর পোপোকভ! আমাদের বাকী গয়নাগুলো মাথার মুকুটের মতো কোন অস্ত্র নয়। ওগুলো আমাদের কাজের সাহায্যকারী কয়েকটি যন্ত্র। যেমন, এই যে নেকলেস দেখছেন এটি একরকম অ্যালার্ম। মাঝখানে যে পদকটি আছে তার ভেতর মাইক্রো-ট্রান্‌জিস্‌টার সহযোগে তৈরী রেডিও সার্‌কিট্‌ আছে। কার্যোপলক্ষে আমাদের হেড্‌ কোয়ার্টার থেকে বাইরে চলে গেলে পর যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে আমাদের অবিলম্বে হেড্‌ কোয়ার্টারে ফেরা দরকার তাহলে এই পদকের ভেতর থেকে নির্গত হয় একরকম সূক্ষ্ম অথচ তীব্র কম্পন যা বুকের ওপর একটা শিহরণের অনুভূতি জাগায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক এক বিশেষ ধরণের ট্রান্স্‌মিটার দ্বারা এই জরুরী আহ্বান পাঠান। এটাকে রেডিও বাজার বলে। আর আমাদের হাতের বালাগুলো হচ্ছে………"

কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল রীনি। একটু যেন সচকিত হয়ে রইলো। জুলিরও একই অবস্থা। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তার পর এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করলো। বোঝা গেল নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। অতি বিচিত্র সেই ভাষা, জটিল-উচ্চারণ সমন্বিত শব্দ সমষ্টি দ্বারা গঠিত। কথার টান, ধ্বনির ওঠানামা এবং উচ্চারণ ভঙ্গী কোন পার্থিব ভাষার মতই নয়। কিন্তু ভাষাটা এমনই ধরনের যে তা' শ্রুতিকটু তো নয়ই উপরন্তু তা'তে এমন একটা মাধুর্য আছে যে বোঝা না গেলেও শুনতে ভালো লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের কথা শেষ করে রীনি আবার রাশিয়ান ভাষায় কথা বললো, "ক্ষমা করবেন আপনারা। আমাদের ঘাঁটিতে ফেরার সময় হয়েছে। সর্বাধিনায়ক আমাদের স্মরণ করেছেন টেলিপ্যাথির মাধ্যমে। অনেকটা সময় চলে গেছে আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে। অথচ আমাদের মূল বক্তব্য, কি জন্যে আমরা আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি তাই এখনো বলা হয়নি। অবিশ্যি আমাদের ওপর তা' বলার ভার নেই। আমাদের সর্বাধিনায়ক বিশদ ভাবে সব কিছু বলবেন আপনাদের কাছে। আপনারা দয়া করে আপনাদের গভর্মেণ্টকে বলুন তাঁরা যেন আগামী ১৮ই ডিসেম্বর আপনাদের রাষ্ট্রপুঞ্জের এক জরুরী অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। সেখানে আমাদের সর্বাধিনায়ক উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। মনে রাখবেন, আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে আপনাদের গভর্মেণ্ট যদি উদাসীন থাকেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনের ব্যবস্থা না করেন তাহলে আপনাদের দেশকে তার ফলভোগ করতে হবে। আর একটা কথা, যা'তে আমাদের কথার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেজন্যে আমাদের ক্ষমতার আর একটা চমকপ্রদ প্রমাণ দেখাবো। আজ হোল ১০ই ডিসেম্বর; তিনদিন পরে ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি আটটার সময় মস্কো শহরের আকাশে আমরা একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটাবো। সারা পৃথিবীতে এই আগামী ঘটনার প্রচারের সুযোগ দেবার জন্যে তিনদিন

সময় দিলাম। মনে রাখবেন ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি আটটা, স্থান মস্‌কো। আপাততঃ আমাদের আর বলবার কিছু নেই, এবার আসি।"

রীনি উঠে দাঁড়ালো, তার সাথে জুলিও। তারপর ওরা দুজন যথাক্রমে বাজানফ আর পোপোকভের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্যারালাইজার যন্ত্রে মোচড় দিলো।

বাজানফ আর পোপোকভ দুজনেই প্রস্তরমূর্তির মতো স্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন।

জুলি ঠোঁটটেপা মিষ্টি মেয়েলি হাসি মুখে ছড়িয়ে বললো, "আমাদের ক্ষমা করবেন আপনারা। যাবার আগে আমরা একটু কৌতুক করে গেলাম আর কি? মাত্র পনেরো মিনিট, তারপরই আপনারা স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। যা বলে গেলাম অবিলম্বে আপনাদের গভর্মেণ্টকে জানান। বিদায়, শুভরাত্রি।"

এই বলে মহাকাশের সেই অপ্সরা দুজন প্রস্থান করলো সেখান থেকে। কিন্তু যাবার আগে জুলি হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসলো যা মেজর পোপোকভ বোধ হয় সারাজীবন মনে রাখবেন। গলা জড়িয়ে ধরে তাঁরা গোঁফদাড়িয়ালা মুখে একটা সশব্দ চুম্বন এঁকে দিলো। তারপর তাঁর থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে চলে গেল।

অপ্রত্যাশিত এই প্রীতির স্পর্শে মেজর পোপোকভের হৃৎপিণ্ডও তাঁর দেহের মতো কিছুক্ষণের স্তব্ধ হয়ে গেছলো কি না তা' গবেষণার বিষয়!

[৯]

বাজানফ আশঙ্কা করেছিলেন সোভিয়েট গভর্মেণ্ট মহাকাশযাত্রিনীদের সংগে তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি বোধ হয় আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন এবং রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনের ব্যাপারে আদৌ

মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হ'ল। তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটিকে যথোচিত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন এবং আগামী আঠারোই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন মারফৎ সারা পৃথিবীতে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ছড়িয়ে পড়লো এবং বলা বাহুল্য সর্বত্র এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো।

এর ওপর রইলো চোদ্দই ডিসেম্বর রাত্রিতে মস্কো শহরে কি ঘটে তা' দেখবার অথবা জানবার জন্যে উদগ্র কৌতূহল। মোট কথা উত্তেজনার সাথে কৌতূহল মিশে অস্থির করে তুললো পৃথিবীর মানুষকে।

অবশেষে এলো বহু-প্রতীক্ষিত সেই চোদ্দই ডিসেম্বর। মস্কোর অধিবাসীরা সন্ধ্যার আগেই নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সেরে দুর্বার কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন কি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে তা' দেখবার জন্যে। সন্ধ্যা নামবার পরই বন্ধ হয়ে গেল সব দোকানপাট, হোটেল ও রেস্তরাঁ। ডিসেম্বরের শীতকে অগ্রাহ্য করে লাখ-লাখ কৌতূহলী দর্শকের ভিড় উপছে পড়লো রাস্তায়, পার্কে, ময়দানে ও বাড়ীর ছাদে। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল—সময় এবং সঙ্গতির দিক থেকে এরকম অনেকেই দেশ-বিদেশ থেকে এসে হাজির হলেন মস্কোতে। জম-জমাট হয়ে উঠলো মহানগর মস্কো। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সারা পৃথিবীর বেতার ষ্টেশনগুলির থেকে রিলে করে শোনাবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

মস্কোর বিভিন্ন স্থানে টেলিভিশন-ক্যামেরা এবং সিনে-ক্যামেরা নিয়ে ওস্তাদ সব ক্যামেরা-ম্যানেরা অধিষ্ঠান হলেন যদি সেই ভবিষ্যৎ অত্যাশ্চর্য ঘটনার ছবি তোলা সম্ভব হয় এই আশায়। মহাকাশ-যাত্রিনীরা বলে গেছে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে কিন্তু কোথায় ঘটবে, আকাশে না ভূপৃষ্ঠে তা' তো বলে যায় নি। তবু কপাল ঠুকে ক্যামেরা

সাজানো থাক। যদি কিছু দৃশ্য ধরে রাখতে পারা যায়।

সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টার আঁচড় কাটতে কাটতে সময় এগিয়ে চলেছে সকলের রুদ্ধ নিশ্বাস প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে।

আট'টা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। সকলের হৃৎ-স্পন্দন দ্রুততর হ'ল, বেড়ে চললো দম আটকে আসা কৌতূহল। অনেকেই উর্দ্ধমুখ হয়ে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে, বোধ হয় আকাশেই ঘটবে কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

অবশেষে আট'টা বাজলো। স্তব্ধ হয়ে গেল মহানগর মস্কো। নিশ্চল হয়ে গেল সব যানবাহন। এবার চরমে উঠেছে উৎসুক মনের চাঞ্চল্য।

হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে শোনা গেল বজ্রের গর্জ্জনের ন্যায় কানে-তালা লাগানো প্রচণ্ড শব্দ। থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো মাটি। প্রায় মিনিট খানেক ধরে হতে থাকলো আকাশের এই মহাগর্জ্জন। তারপর হঠাৎ খেমে গেল সেই শব্দ। আর থামবার সংগে সংগেই মস্কো-শহরের আকাশ রক্তিম বর্ণের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো। মনে হলো জ্বল্ছে যেন আকাশটা। প্রায় আধ মিনিট পরে রং বদলালো। উজ্জ্বল কমলা রংএর আলোকধারায় রঞ্জিত হয়ে উঠলো আকাশটা। তারপর হল্‌দে, সবুজ···একে একে রামধনুর সাতটি রংএর আলো খেলে গেল আকাশে। তারপর যেন সাতটি রং মিশে গিয়ে সাদা আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো উর্দ্ধাকাশ। সেই আলোকে প্রায় দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো মস্কো শহরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, যানবাহন, লোকজন সবকিছু।

তারপর হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করে দেবার মতো এক অতি ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়লো উর্দ্ধাকাশে; মনে হলো যেন এক সংগে গর্জ্জন করছে অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার। তারপর ঘটলো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। হঠাৎ দেখা গেল আকাশে ভেসে চলেছে বিশাল আকারের ভয়ঙ্কর চেহারার কয়েকটি অজ্ঞাত পরিচয় জানোয়ার। প্রাগৈতি-

হাসিক যুগের টাইরানোসেরাসের মতো দেখতে কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা। অতি ভয়াল তাদের মুখের চেহারা আর আটখানা করে পা রয়েছে প্রত্যেকের। প্রচণ্ড গর্জ্জন করতে করতে আর বিশাল লেজ নাড়তে নাড়তে তারা আকাশের এদিক ওদিক অবলীলাক্রমে ভেসে চলেছে। ঐসব বিশাল আকারের জীব ডানার সাহায্য না নিয়ে কি করে এমন স্বচ্ছন্দে আকাশে ভেসে থাকতে পারে সেটাই তো একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার! কিছুদিন আগে বিজ্ঞানী নিকোলাই গ্রাডভের নেতৃত্বে যে বিজ্ঞানীদল সাইবেরিয়াতে প্রস্পেক্টিং-এর কাজে গেছলেন তাঁদের অনেকেই আজ মস্কোতে আছেন। তাছাড়া মেজর পোপোকভ এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর কয়েকজনও উপস্থিত আছেন আজ। তাঁরা সকলেই আকাশে বিচরণশীল ঐ অতিকায় জন্তুদের চিনলেন। ঐরকমই একটা জন্তু তো তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল সাইবে-রিয়ার প্রান্তরে। কি আশ্চর্য! তাহলে এই জন্তুগুলো কি 'রিগেলা' গ্রহের অধিবাসীদের পোষা জানোয়ার? এরকম ভয়ঙ্কর জানোয়ার গুলোকেও কি তারা সংগে নিয়ে এসেছে? এই রাক্ষুসে জানোয়ার-গুলোকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলে আর দেখতে হবে না! মস্কোর মতো বড় বড় শহরকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি বোধহয় রাখে তারা। কামান বন্দুকের গুলী গোলায় ওদেরকে ঘায়েল করা সম্ভব নয় তা'তো মেজর পোপোকভের রিপোর্ট থেকে জানা আছে সকলের। অবিশ্যি 'ব্যালিষ্টিক্ মিশাইল' বা 'নিউক্লিয়ার বোম' দিয়ে হয়তো ওদের ধ্বংস করা যেতে পারে। কিন্তু তা' সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে হলে এই জানোয়ারগুলোর একত্রে থাকা দরকার। ওরা যদি চার দিকে ছড়িয়ে থাকে, আলাদা ভাবে থাকে তা'হলে প্রত্যেকটাকে নিকাশ করতে তো ঐসব সাংঘাতিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। সেরকমভাবে ব্যবহার করলে রাক্ষুসে জানোয়ারগুলো হয়তো ধ্বংস হবে কিন্তু ওদের সংগে সংগে পৃথিবীর অনেক জায়গায় যে সংঘটিত হবে সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা!

কিন্তু ঐ অতিকায় বিভীষিকাগুলিকে নিয়ে আর চিন্তা করার প্রয়োজন হলো না। কারণ মাত্র মিনিট চার-পাঁচ আকাশে দাপাদাপি করে বেড়িয়ে হঠাৎ তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ইন্দ্রজালের মতো! তারপর ঘটলো আর একটা আশ্চর্য ঘটনা। বিস্ময়করভাবে আলোকিত রাত্রির আকাশে হঠাৎ দেখা গেল একটা বিচিত্র-পদার্থ তীব্রবেগে একদিক থেকে এসে রেড্‌স্কোয়ারের অনেক ওপরে উর্দ্ধাকাশে স্থির হয়ে রইলো। কারো আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ঐ বিরাট জিনিষটা 'রিগেলার' অধিবাসীদের মহাকাশযান। অতঃপর কয়েক মুহূর্ত পরে সারা আকাশে গমগমে আওয়াজ তুলে রাশিয়ান ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শোনা গেল:— "পৃথিবীর বন্ধুগণ! রিগেলার অভিযাত্রীদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যে জানাবার জন্যে আপনাদের রাষ্ট্রপুঞ্জের একটা অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। মনে রাখবেন, আঠারোই ডিসেম্বর সকাল দশটায় এই অধিবেশন হওয়া চাই। এবার আপনারা আরাম করুন। আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের ঘাঁটিতে। আঠারোই ডিসেম্বর, সকাল দশটা, মনে রাখবেন। বিদায়, শুভরাত্রি!"

কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ মিলিয়ে গেল আকাশের সেই বিস্ময়কর আলো। রিগেলার ইন্দ্রজালের ওপর নেমে এলো যবনিকা। সব কিছু থেমে যাবার পরও অনেক স্তম্ভিত হয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। এই অকল্পনীয় অলৌকিক ঘটনাবলীর চমক স্তব্ধ, মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে সকলকে। তারপর বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো সুরু হোল নানা আলোচনা, মন্তব্য আর কল্পনা।

ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীদের পৃথিবীতে আগমনের বিষয়ে যাদের এখনো পর্যন্ত কিছুটা সন্দেহ ছিল তারা এবার নিঃসন্দেহ হোল।

সারা পৃথিবীর মানুষের মনে জাগলো ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনা জানবার জন্যে দুর্নিবার কৌতূহল।

এক সার্বজনীন প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে অবশেষে এসে গেলো সেই বহু-বিঘোষিত ১৮ই ডিসেম্বর। সকাল দশটায় অধিবেশন বসবার কথা কিন্তু শেষ রাত্রি থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশাল অট্টালিকার চতুর্দিকে ভিড় জমতে সুরু করেছে। সকাল আটটার মধ্যে ভিড় এতো বেশী হয়ে গেল যে তা' সামলাতে পুলিশকে রীতিমত হিম্‌সিম্ খেতে হোল। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নামকরা রিপোর্টারের দল অধিবেশন কক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে আসীন হলেন। অধিবেশন কক্ষের কয়েকটি সুবিধাজনক স্থানে সিনে ক্যামেরা ও টেলিভিসান ক্যামেরা বসানো হ'ল অধিবেশনের সম্পূর্ণ ছবি তোলবার জন্যে এবং পৃথিবীর লোকের সামনে এই অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকারের দৃশ্য তুলে ধরবার জন্যে।

অধিবেশন কক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চললো। দশটা বাজতে মাত্র আর কয়েক মিনিট বাকী। রাষ্ট্র-প্রতিনিধিগণ, রিপোর্টারগণ এবং মান্যগণ্য অতিথিগণ যাঁরাই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় প্রত্যেকেরই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হোল, চরমে উঠলো কৌতূহল। বিরাট অধিবেশন কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিলো না কিন্তু দশটা বাজবার কয়েকমিনিট আগে থেকেই যেন এক অব্যক্ত আদেশে সকলেই ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে এলেন। স্তিমিত হতে হতে অবশেষে একেবারে থেমে গেল সকল কলগুঞ্জন।

সেকেণ্ডের পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সময়। আর কয়েক সেকেণ্ড দশটা বাজতে। বাইরে যারা ছিল তাদের সকলের চোখ আকাশমুখো হয়ে আছে।

হঠাৎ দিনের আলো নিভে গিয়ে আল্‌কাতরার মতো গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল চতুর্দিক। আগে যেমন তিনবার হয়েছিল সেইরকম ভাবে। সমবেত জনতা বিস্ময়-বিমূঢ় ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এই অবস্থায়

একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মহা অনর্থ ঘটতে পারতো কিন্তু আর একটা ঘটনায় এমন চমক সৃষ্টি হল যে তা' স্তব্ধ করে রেখে দিল ওই বিশাল জনতাকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন উর্দ্ধাকাশে শোনা গেল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর যার মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রচণ্ডতায় সমস্ত আকাশ গম্‌গম্‌ করে উঠলো। সেই কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ইংরেজীতে বললো, "বন্ধুগণ! রিগেলার পৃথিবী অভিযানের অধিনায়ক ম্যাগমাস্ রডিনের অভিবাদন গ্রহণ করুন। হঠাৎ এই অন্ধকারে আপনারা ভয় পাবেন না। কয়েক সেকেণ্ড পরেই এই অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার দিনের আলো প্রকাশ পাবে। আপনারা যে য়েখানে আছেন সেখানেই থাকুন, কোন রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবেন না।

থেমে গেল আকাশের সেই কণ্ঠস্বর কিন্তু কি শক্তি ছিল তার মধ্যে জানি না তার প্রভাবে অতো বিশাল জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলো। কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ অন্ধকার চোখের পলকে অন্তর্হিত হয়ে আবার ফুটে উঠলো উজ্জ্বল দিবালোক। সব ব্যাপারটাই যেন এক বিরাট ঐন্দ্রজালিকের অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজাল!

দিনের আলো ফুটে উঠতেই জনতা সবিস্ময়ে দেখলো একটি বিচিত্রদর্শন পদার্থ রাষ্ট্রপুঞ্জ-ভবনের অনতিদূরে মাটি থেকে মাত্র দশ-বার মিটার উঁচুতে স্থির হয়ে আছে।

এটি হ'লো রিগেলার অধিবাসীদের আকাশযান. যেরকম আকাশ-যানে চড়ে রীনি ও জুলি বিজ্ঞানী বাজানফের বাগানে আবির্ভূতা হয়েছিল।

অতঃপর সেই আকাশযান রাষ্ট্রপুঞ্জ-ভবনের প্রধান প্রবেশপথের সামনে একটি উন্মুক্ত স্থানে ধীরে ধীরে নামলো মাটিতে, বিশাল জনতার সহস্র সহস্র কৌতূহলী চোখের দৃষ্টির সামনে। সিনে-ক্যামেরা, টেলিভিশন-ক্যামেরা এবং প্রেস্ রিপোর্টারদের ক্যামেরা সচল হয়ে উঠলো।

মাটিতে নামবার কয়েক মুহূর্ত পরে আকাশযানের কেবিনের দরজা খুলে গেল এবং ভেতর থেকে দীর্ঘাকৃতি, বোধ হয় সাড়ে ছ'ফুটের ওপর লম্বা এবং 'মিস্টার ইউনিভার্স' হবার উপযুক্ত সুঠাম চেহারার একজন অতি সুদর্শন তরুণ ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো। পরণে যেমন বিস্ময়কর সুন্দর পোষাক তেমনই অপূর্ব দেবদুর্লভ চেহারা! কি বলিষ্ঠ তেজোদীপ্ত চলনভঙ্গী! দর্শকদের মনে হলো যেন গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো আবির্ভূত হলেন তাদের সামনে।

অতঃপর সেই তরুণ হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "সুপ্রভাত বন্ধুগণ! আমি রিগেলা গ্রহের 'প্রজেক্ট আর্থ'-এর অধিনায়ক ম্যাগমাস্ রডিন্। আমাদের গ্রহের প্রেসিডেণ্টের বিশেষ নির্দেশে আমি এসেছি আপনাদের পৃথিবীতে। আমার যা' বক্তব্য তা' আমি আপনাদের রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে বলবো। আসুন তাড়াতাড়ি সভার কাজ আরম্ভ করা যাক।"

রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে কয়েকজন বিশেষ গণ্যমান্য প্রতিনিধি এগিয়ে এসে তাঁর সংগে করমর্দন করলেন। তারপর তাঁকে স-সম্মানে অধিবেশন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সংগে সংগে কক্ষের ভেতরে প্রেস-রিপোর্টারদের ক্যামেরার ফ্লাশ্-বাল্ব্ জ্বলে উঠলো বিদ্যুৎ চমকের মতো। টেলিভিশন-ক্যামেরা, সিনে ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চালু হয়ে উঠলো। নিউইয়র্ক ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন এর তরফ থেকে এই অধিবেশন রিলে করবার জন্যে যে সব ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের যন্ত্রপাতি চালু করে দিলেন।

এক গাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্যে অধিবেশন আরম্ভ হলো। প্রথমে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রিগেলার প্রতিনিধিকে স্বাগতম্ জানালেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানালেন তাঁর বক্তব্য জানাবার জন্যে।

অতঃপর ক্যাপ্টেন ম্যাগমাস্ রডিন্ উঠে দাঁড়ালেন এবং গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠে আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা :—"বন্ধুগণ! আশা করি

আপনারা ইতিমধ্যে সকলেই অবগত হয়ে গেছেন যে আমরা আপনাদের সৌরজগতের বাইরে অন্য সৌরজগৎ থেকে এসেছি। 'ক্যানিস্ মাইনর' নক্ষত্রপুঞ্জের 'প্রোকিয়ম' নামে যে নক্ষত্র আছে সেই নক্ষত্রের একটি গ্রহ হলো রিগেলা, অবশ্য আমাদের দেওয়া নামকরণ অনুসারে। আমরা রিগেলার অধিবাসী। আপনাদের পৃথিবী থেকে আমাদের গ্রহের দূরত্ব প্রায় এগারো আলোকবর্ষ।

"আপনাদের পৃথিবীর তুলনায় আমাদের গ্রহ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং সভ্যতায় অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে। আমাদের বিজ্ঞান আপনাদের বিজ্ঞানের তুলনায় এতো বেশী উন্নতপর্যায়ে উপস্থিত হয়েছে যে তা' আপনাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। আপনাদের অসাবধানতায় যদি ইতিমধ্যে আপনাদের পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায় তা'হলে বিজ্ঞানে আমাদের সমান উন্নতি করতে এখনো আপনাদের প্রায় হাজার বছর লাগবে। সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা আপনাদের থেকে অনেক উর্দ্ধস্তরে আছি। আমরা জেনেছি আপনাদের পৃথিবীতে কতো দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, অনাহার, হিংসা ও হানাহানির রাজত্ব। অনাহারে এবং রোগে বিনা চিকিৎসায় যখন আপনাদের পৃথিবীর হাজার হাজার লোক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করছে তখন আপনাদেরই পৃথিবীর লোকেরা গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এই জন্যে কোটি কোটি টাকা জলের মতো খরচ হচ্ছে। আপনাদের কয়েকটি শক্তিশালী দেশ গ্রহান্তরে যাত্রায় পরিকল্পনায় যে বিপুর পরিমাণে অর্থব্যয় করছে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র যদি আপনাদের মানব সমাজের কল্যাণে খরচ করা হতো তা'হলে পৃথিবীর অনেক লোককে এইভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে হতো না। আপনাদের মানুষে মানুষে কতো ভেদ, কতো বর্ণবিদ্বেষ যা' দেখে আমরা বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়েছি।

"আপনারা মানুষকে বড় করে না দেখে, মানুষের কল্যাণের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ না করে যে যা'র নিজের স্বার্থকে বড় করে

দেখেন। তার ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে যখন এক দেশ চাঁদে, মঙ্গলে এবং শুক্রে রকেট পাঠাচ্ছেন তখন অন্য দেশের শতশত লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সামান্য রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে এক দেশের লোক অন্য দেশের ওপর চড়াও হয়ে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

"আমাদের কাছে এটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং মর্মান্তিক বলে মনে হয় যে এখনও আপনাদের পৃথিবীতে যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয় যারা সেই সব যুদ্ধের যোদ্ধা নয়। আপনাদের এই পৃথিবীতে যাদের চামড়া সাদা তারা ঘৃণা করে কালো চামড়ার লোককে। সাদা কালোর এই বিদ্বেষে কতো খুন জখম হচ্ছে।

"আপনাদের এই পৃথিবীতে একদেশের লোক অফুরন্ত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে অথচ আর এক দেশে দেখা যায় কতো মানুষ পশুর মতো জঙ্গলে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। আমাদের সভ্যতার মানদণ্ডে বিচার করলে আপনাদের সভ্যতা এখনো অনেক নিম্নস্তরে রয়েছে। আমার এই রূঢ় সত্য ভাষণের জন্যে আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আপনাদের পৃথিবীতে এসে যা' আমরা দেখেছি এবং দেখে আমাদের যা' মনে হয়েছে তা' অকপটে বললাম আপনাদের কাছে। আপনারা আমার কথাগুলো একটু চিন্তা করে দেখবেন। আপনাদের পৃথিবীর মানব সভ্যতার কোনরূপ সমালোচনা করবার জন্যে আমরা মহাকাশ অতিক্রম করে এতোদূর আসিনি। আমাদের কিছু স্বার্থের খাতিরে আমরা এসেছি। এইবার সেই কথাটাই বলছি শুনুন।

"আমাদের রিগেলা আপনাদের পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গের মতো। সেখানে যুদ্ধ নেই, নেই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ, নেই দুর্ভিক্ষ এবং অনশনে মৃত্যু, নেই আপনাদের পৃথিবীর মতো এতো

রোগ ব্যাধি। সেখানে প্রতিটি মানুষ প্রচুর আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার মধ্যে বাস করে। আমাদের বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু এতো সুখের মধ্যেও আমরা এক সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগে আমরা এতো বেশী পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করেছি যে সবরকম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা-সত্বেও আমাদের গ্রহের আকাশ-বাতাস জল-স্থল গাছ-পালা সব কিছুই রহস্য-জনক ভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। এই তেজস্ক্রিয়তা এতো সূক্ষ্ম যে খুব শক্তিশালী যন্ত্র ছাড়া তা' ধরা পড়ে না। বহুকাল ধরে এই সূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয়তা রিগেলার অধিবাসীদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে নি বটে কিন্তু আমরা কোনদিন আশঙ্কা করতে পারিনি, এর ফলে আমরা রিগেলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছি।"

এই পর্যন্ত বলে ম্যাগম্যাস্ রডিন্ চুপ করলেন বোধহয় দম নেওয়ার জন্যে কিংবা তাঁর শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যে। সেই বিরাট হলে বিরাজ করছে জমাট স্তব্ধতা। প্রতিটি মানুষ বক্তৃতা শুনছিলেন রুদ্ধ নিশ্বাসে। তাঁর শেষ কথায় সকলের মনেই সৃষ্টি হলো দারুণ কৌতূহল। জ্ঞানে বিজ্ঞানে এমন অবিশ্বাস্য ভাবে উন্নত রিগেলার অধিবাসীদের কি এমন বিপদ উপস্থিত হয়েছে যার ফলে তারা লোপ পেতে বসেছে ?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ম্যাগমাস্ আবার বলতে লাগলেন, "আমরা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছি এই জন্যে যে আমাদের গ্রহে আর কারো জন্ম হচ্ছে না। মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হচ্ছে কিন্তু জন্ম অর্থাৎ নতুন জীবনের সৃষ্টি আর হচ্ছে না। সুতরাং রিগেলার মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। অতএব ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে রিগেলাতে মানুষ আর থাকবে না। এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা যে লোপ পেতে চলেছি একথাটা কতো মর্মান্তিক ভাবে সত্যি।"

আবার চুপ করলেন ম্যাগমাস্। রিগেলাতে যে মর্মান্তিক সম্ভাবনার

ইঙ্গিত দিলেন তা শ্রোতাদের উপলব্ধি করবার জন্যে বোধহয়।

তিনি থামতেই সভাকক্ষে ফিরে এলো আবার সেই নিছিদ্র স্তব্ধতা। কারো মুখে কথা নেই।

কয়েক সেকেণ্ড পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের গ্রহে আর মানুষের জন্ম হচ্ছে না কেন?"

এই প্রশ্নে একটা মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়লো ম্যাগমাসের মুখের ওপর। তিনি জবাব দিলেন, "আর মানুষের জন্ম হচ্ছে না কারণ আমাদের গ্রহে সমস্ত পুরুষ আর নারীর প্রজনন যন্ত্র নিস্ক্রিয় হয়ে গেছে, সমস্ত নারী বন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং পুরুষদেরও লুপ্ত হয়েছে উৎপাদন শক্তি। বাইরে থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন পরিবর্তন দেখা যাবে না এবং স্ত্রী-পুরুষের যৌন জীবনও স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে দেহের অভ্যন্তরে যে সব যৌন গ্রন্থি আছে তা' নিস্ক্রিয় হয়ে গেছে। এর ফলে আমাদের জীবনের অন্য সব ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকলেও সন্তান উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর আমাদের পৃথিবীতে এর ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটছে; লোক সংখ্যা কমে আসছে। মৃত্যুতে যে লোকক্ষয় হচ্ছে জন্ম না হওয়ায় তার তো ক্ষতিপূরণ হচ্ছে না।"

আবার চুপ করলেন ম্যাগম্যাস্।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনারা বিজ্ঞানে এতো উন্নত তবু এর কিছু প্রতিকার করতে পারছেন না?"

বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে ম্যাগমাস্ জবাব দিলেন, "না, সেইটাই তো আমাদের পক্ষে চরম বিয়োগান্ত ব্যাপার! আমাদের বিজ্ঞান কতো অসাধ্য সাধন করেছে। আমরা মৃত্যুকে পিছিয়ে দিয়েছি। প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য দূরীভূত করে যৌবনকে স্থায়ী করতে পেরেছি। রোগ প্রায় নির্মূল করেছি আমাদের পৃথিবী থেকে। আরো কত কী করেছি যা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি।"

এবার রাষ্ট্রসংঘের একজন সদস্য প্রশ্ন করলেন, "কতদিন থেকে আপনাদের গ্রহে এই ব্যাপার ঘটছে ? অর্থাৎ নতুন জন্ম আর হচ্ছে না ?"

ম্যাগমাস্ জবাব দিলেন, "আমাদের গ্রহে এই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে প্রায় দু'শো বছর আগে। এই দু'শো বছরের মধ্যে রিগেলাতে একটিও নতুন মানুষের জন্ম হয় নি। এই ব্যাপার যদি চলে তাহলে আর প্রায় একশো বছর পরে আমাদের গ্রহে আর মানুষ থাকবে না। আমি এবং আমার সহকর্মীরা যাঁরা আপনাদের পৃথিবীতে এসেছেন, আমরা সকলেই রিগেলার শেষ সন্তানের শ্রেণীভুক্ত। আমাদের পরে আর কারো জন্ম হয় নি। অবশ্য আমাদের সমবয়স্ক কয়েক কোটী মানুষ রয়েছে আমাদের গ্রহে। আমাদেরকে রিগেলার মানবজাতির শেষ বংশধর বলতে পারেন।"

একজন জার্মান সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনার বয়স কি তা'হলে দু'শো বছর ? কেন না আপনি বলছেন যে আপনারাই রিগেলার শেষ বংশধর এবং আপনাদের পরে দু'শো বছরের মধ্যে আর কারো জন্ম হয় নি। সুতরাং এর থেকে এই স্বতঃসিদ্ধান্ত কি ঠিক নয় ?"

মৃদু হেসে ম্যাগমাস জবাব দিলেন, "আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক, আমার বয়স দু'শো বছর।"

অধিবেশন কক্ষের সকলেই দারুনভাবে বিস্মিত হলেন। একজন আমেরিকান সাংবাদিক বললেন, "বলেন কি স্যার! আপনার বয়স দু'শো বছর ? অথচ আপনাকে দেখে তো তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণ ছাড়া আর কিছু মনে করা অসম্ভব।"

ম্যাগমাস বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি যে আমাদের গ্রহে আমরা যৌবনকে স্থায়ী করতে পেরেছি। প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এই রকম যৌবনপুষ্ট অবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু হয়। তা ছাড়া মৃত্যুকে আমরা এতদূর পিছিয়ে দিয়েছি যে আমাদের গ্রহে মানুষের সাধারণ পরমায়ু তিন শো বছর।"

একজন ভারতীয় সাংবাদিক বললেন, "আপনার কথা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আপনি আরো একশো বছর বাঁচবেন। আপনার সমবয়স্ক যে কয়েক কোটি নরনারী আপনাদের গ্রহে আছেন তাঁদের সকলের পক্ষে একথা খাটে অর্থাৎ সকলেই আর একশো বছর বাঁচবেন। তা' হলে বোঝা যাচ্ছে যে একশো বছর পরে রিগেলাতে মানুষ আর থাকবে না বললেই হয়। কেমন তাই না?"

ম্যাগমাস বললেন, "একশো বছর পরে আমাদের গ্রহ মানবহীন হয়ে যাবে। সেটা যা'তে না হয় তার প্রতিকার করবার জন্যেই আমরা আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি।"

এবার রাষ্ট্রসংঘের একজন সদস্য বললেন, "আপনারা কিভাবে প্রতিকার করবেন তা আমরা পরে শুনবো। তার আগে একটা কথা জানতে কৌতূহল হয়। আপনাদের পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তু নিশ্চয়ই আছে। তারাও কি লোপ পেয়ে আসছে?"

ম্যাগমাস জবাব দিলেন, "না, সেইটাই তো মজার ব্যাপার। আমাদের গ্রহে যে সব পশু পক্ষী আছে তাদের মধ্যে সন্তান সৃষ্টি ঠিক স্বাভাবিক আছে। যে সূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয়তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি তার কোন প্রতিক্রিয়া আমাদের গ্রহের পশুপক্ষীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। তাদের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে। অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে শুধু আমাদের গ্রহের মানুষদের মধ্যে। শুধু মনুষ্য-সমাজের সন্তান জন্মই লোপ পেয়ে গেছে। আর একশো কি বড়জোর দেড়শো বছর পরে আমাদের গ্রহে মানুষ আর থাকবে না। থাকবে খালি পশুপক্ষী এবং কীটপতঙ্গ।"

"একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনি এর কি প্রতিকারের কথা বলছিলেন?"

ম্যাগমাস জবাব দিলেন, "জানি না প্রতিকারের কথাটা বললে আপনারা কি ভাবে তা' গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবুও আমি বলতে

বাধ্য হচ্ছি। আমরা চাই আপনাদের পৃথিবী থেকে কিছু লোককে আমাদের গ্রহে নিয়ে যেতে। অবশ্য আমরা কাউকে জোর করবো না। যে সব নরনারী স্বেচ্ছায় আমাদের গ্রহে যেতে চাইবেন তাঁদেরই শুধু আমরা নিয়ে যাবো। ভেবে দেখুন আপনাদের পৃথিবীর তুলনায় আমাদের পৃথিবী স্বর্গের মতো। সেখানে দুঃখ দারিদ্র্য কিছু নেই। আছে শুধু অফুরন্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। যাঁরা সানন্দে আমাদের গ্রহে যেতে চাইবেন তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারেন। তাঁরা আমাদের গ্রহে গিয়ে নিজেদের মধ্যে মনের মতো সঙ্গী-সঙ্গিনী ঠিক করে সুখের সংসার গড়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবেন। তাঁদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা আমরাই করে দেবো। তাঁদের ভাগ্য আপনাদের পৃথিবীর লোকের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের প্রতিভার বিকাশের এমন সুযোগ আমরা করে দেবো যা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। মোট কথা যাঁরা আমাদের গ্রহে স্বেচ্ছায় যাবেন তাঁরা সব দিক দিয়েই লাভবান হবেন। ভেবে দেখুন কি বিরাট রকমের লোভনীয় প্রস্তাব আমরা তাঁদের সামনে উপস্থিত করছি। প্রথমতঃ মহাকাশ অতিক্রম করে আপনাদের সৌরজগতের বাইরে এগারো আলোকবর্ষ দূরের অন্য একটি সৌরজগতের গ্রহে যাওয়ার মধ্যে কতখানি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার উপাদান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের গ্রহ থেকে বহুগুণে উন্নত একটি গ্রহে অচিন্ত্যনীয় আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশে সীমাহীন আরাম ও আনন্দের মধ্যে জীবন কাটানো কতখানি কামনার বিষয় চিন্তা করুন। যাঁরা আমাদের গ্রহে যাবেন তাঁদের প্রত্যেকের আয়ু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অন্ততঃ দু'শো বছর সকলেই বাঁচবেন। সুতরাং একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পৃথিবীর লোকের বংশ-ধরেরাই আমাদের গ্রহের মালিক হয়ে দাঁড়াবে। তখন রিগেলার আসল অধিবাসীদের কেউ থাকবে না।”

আবার তিনি থামতে একজন সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন, "বেশ, ক্যাপটেন ম্যাগ্‌মাস! একটা প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না। আপনারা আমাদের পৃথিবী থেকে লোক নিয়ে গিয়ে আপনাদের গ্রহে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবেন বলছেন এবং একথাও বলছেন যে, কালক্রমে তাদের বংশধরেরাই আপনাদের গ্রহের মালিক হয়ে দাঁড়াবে। খুব উত্তম প্রস্তাব; কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হলো যে, তা'তে আপনাদের কি লাভ? আপনারা মহাকাশ অতিক্রম করে অতি সুদূর এক গ্রহ থেকে এসেছেন আমাদের পৃথিবীর মানুষের হাতে আপনাদের গ্রহের মালিকানা স্বত্ব তুলে দেবার জন্যে। কিন্তু কেন?"

ম্যাগ্‌মাস জবাব দিলেন, "আপনার প্রশ্ন খুবই ন্যায়সঙ্গত; এতে আমার মনে করার কিছুই নেই। আমাদের এই কাজের ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের কিছু লাভ হবে না বটে তবে আমরা কিছুটা তৃপ্তি পাবো। যখন আমরা দেখলাম যে রিগেলার বুক থেকে আমাদের লোপ প্রাপ্তি অবধারিত তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও এমন কিছু প্রাণীকে আমরা আমাদের গ্রহে নিয়ে আসবো যাদের দৈহিক এবং মানসিক গঠন আমাদেরই মতো। তারাই আমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎ মালিক ও অধিবাসী হবে। আমরা চাইছিলাম না যে আমাদের বিজ্ঞানের এবং সভ্যতার এতো উন্নতি নিস্ফল হয়ে যায় আমরা চলে যাবার পর আমাদের স্বর্গের মতো গ্রহে শুধু পশু-পক্ষীর রাজত্ব কায়েম হওয়ার ফলে। যে সব মানুষকে আমরা আনবো এবং তাদের পূর্বপুরুষ বলে গণ্য হওয়ার সম্মান পাবো। এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার ছিলো না।

"এরকম সিদ্ধান্ত করবার পর আমাদের গ্রহকে কেন্দ্র করে পনের আলোকবর্ষ দূরত্বের ব্যাসার্দ্ধ নিলে যে বিরাট বৃত্ত হয় তার মধ্যে যত গ্রহ আছে সব আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে একমাত্র আপনাদের গ্রহেই অবিকল আমাদের মত দেখতে মানুষ বাস করে। অবশ্য

এই বিরাট বৃত্তের মধ্যে আরো এমন কয়েকটি গ্রহে আমাদের পর্যবেক্ষক দল গেছলেন সেখানে উন্নত শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। কিন্তু তাদের দৈহিক গঠন আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরকম কোন প্রাণীকে আমাদের গ্রহে ভবিষ্যৎ মালিকরূপে কল্পনা করা আমাদের আদৌ মনঃপুত হ'লো না। তা' ছাড়া তারা আমাদের প্রস্তাবে নির্বিচারে সম্মতি দেবে এমন আশাও ছিল না। সুতরাং আমরা অনেক চিন্তা করে স্থির করলাম যে আপনাদের পৃথিবীতে আমরা অভিযাত্রীরূপে যাব এবং আপনাদের পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের প্রস্তাব রাখবো। এরকম সিদ্ধান্ত করার পর দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো আপনাদের পৃথিবীতে আমাদের অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব। আমাদের গ্রহের সেরা মহাকাশ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এক বিশেষ সমিতি গঠন করা হলো এই উদ্দেশ্যে। সমিতিতে আলোচনা করে স্থির করা হলো যে আমাদের অভিযাত্রীদল সোজা-সুজি আপনাদের পৃথিবীতে আসবে না। তা'তে অনেক অসুবিধা ছিলো। সেই জন্যে পরিকল্পনা করা হলো যে আপনাদের সৌরজগতে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে যে সব গ্রহানুপুঞ্জ রয়েছে তার মধ্যে সুবিধাজনক একটি অ্যাস্টরয়েড্‌কে আমাদের অভিযানের প্রাথমিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা হবে। এই অ্যাস্টরয়েড নির্বাচনের জন্য একদল পর্যবেক্ষক পাঠানো হ'লো। তাঁরা আপনাদের সৌরজগতে এসে গ্রহানুপুঞ্জের মধ্যে ঘুরেফিরে অবশেষে হার্মিস্ নামে অ্যাস্টরয়েড্-টিকে নির্বাচন করলেন। তাঁরা রিগেলাতে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করার পর সমিতির বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে ঐ হার্মিসকে সরিয়ে আপনাদের পৃথিবীর কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। তদনুসারে সমিতির বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা এসে হার্মিস্‌কে সরিয়ে নিয়ে এলেন আপনাদের পৃথিবীর কাছে, আপনাদের চাঁদের কক্ষপথের কিছুটা বাইরে। এই ভাবে আমাদের প্রাথমিক ঘাঁটি তৈরী হোল।"

রাষ্ট্রসংঘের একজন আফ্রিকান্ সদস্য উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে

উঠে বললেন, "কি সাংঘাতিক কথা! আপনারা এগারো আলোক-বর্ষ দূরের একটা গ্রহ থেকে কখন এসে আমাদের সৌরজগতে ঢুকলেন এবং আমাদের একটা অ্যাস্টরয়েড্‌কে চাঁদের কাছে সরিয়ে নিয়ে এলেন আমরা তার কিছুই জানতে পারিনি। আপনি স্যার্‌, দয়া করে জানাবেন কি হার্মিসকে নির্বাচন করবার বিশেষ কোন কারণ ছিলো কি এবং কি ভাবে সেটিকে সরিয়ে আনলেন?"

ম্যাগমাস আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁদের অভিযানের সমস্ত রহস্য প্রকাশ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছিলেন। তাই আফ্রিকান্‌ সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অমায়িক হাসি হেসে জবাব দিলেন, "আমরা হার্মিসকে নির্বাচন করেছিলাম তার কারণ আপনাদের মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে যতগুলো অ্যাষ্টরয়েড্‌ আছে তাদের মধ্যে এটি ক্ষুদ্রতম। এর ব্যাস এক মাইলেরও কম সুতরাং এটিকে আমাদের ইচ্ছামত্‌ কক্ষপথে সরিয়ে আনতে আমাদের সুবিধেই হয়েছিল। আমাদের বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা আঁকজোক কষে, হিসেব করে এই হার্মিসের ওপর গোটা কয়েক শক্তিশালী জেট্‌ বসিয়ে কাজ উদ্ধার করেছিলেন। এই জেটের ঠেলায় হার্মিস সরে এসেছে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে।"

এবার একজন ভারতীয় সদস্য, বাঙ্গালী, উঠে দাঁড়ালেন। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন্‌ ম্যাগমাস্‌! আপনি আজ আমাদের অনেক নতুন কথা শোনালেন। খোলাখুলিভাবেই সব কিছু আলোচনা করেছেন আপনি তবু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সেটা হলো এই যে, আমাদের পৃথিবীর যে সব নরনারীকে আপনারা নিয়ে যাবেন আপনাদের গ্রহে তাঁরাও তো সেই সূক্ষ্ম তেজস্ক্রিয়তার পাল্লায় পড়বেন। সুতরাং তাঁদেরও প্রজনন-গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিশ্চয়ই। তাহলে তাঁদের সন্তান-জন্ম হয়ে বংশ বৃদ্ধি হবে কি করে? তাঁরাও তো একদিন লোপ পেয়ে যাবেন রিগেলার বুক থেকে! জানতে ইচ্ছে হয় এই সমস্যার

সমাধান আপনারা করবেন কি করে ?”

স্মিতমুখে ম্যাগমাস্ জবাব দিলেন, “মাননীয় সদস্য মহাশয়, আপনার প্রশ্নে আপনার দূরদর্শিতার প্রমাণ পেলাম। আপনি যে সমস্যার কথা উল্লেখ করলেন তার সমাধান আমরা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। আমরা বর্তমানে যে ভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করি তাতে তেজস্ক্রিয়তার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। প্রায় একশো বছর হোল আমরা এই প্রণালী আবিষ্কার করেছি। এখন ব্রিগেলার আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে আর তেজস্ক্রিয়তা প্রায় নেই বললেই হয়। সুতরাং এখন বাইরের কোন জগৎ থেকে আমাদের গ্রহে মানুষ গেলে তাকে আর এমন কোন তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হতে হবে না যার ফলে তার প্রজনন-গ্রন্থি নিস্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। তা'হলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনাদের পৃথিবী থেকে যে সব নর-নারী আমাদের গ্রহে যাবেন তাঁদের বংশরক্ষার পক্ষে কোন বাধাই আর নেই।”

এবার তিনি থামতে রাষ্ট্রসংঘের একজন আমেরিকান সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনার খোলাখুলি আলোচনার জন্যে অনেক ধন্যবাদ স্যার! আপনার কথা যতই শুনছি ততই আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তবে আরো কয়েকটি বিষয় আছে যার ওপর আপনি দয়া করে আলোকপাত করলে আমাদের কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ হবে। আমি একটা একটা করে জিজ্ঞেসা করছি আপনি সেইমত উত্তর দিন। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আমাদের বিজ্ঞানী অভিজিৎ সিংহ যখন হার্মিসের নতুন অবস্থান প্রথম জানতে পারেন তখন সেখান থেকে একটা সঙ্গীত ধ্বনি কয়েকদিন ধরে শোনা গেছলো কেন ?”

ম্যাগমাস বললেন, “ওটা আমাদের একটা খেয়াল বলতে পারেন। খামখেয়াল বলতেও আপত্তি নেই। আমরা একটা বিশেষ ধরনের বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে আপনাদের পৃথিবীর লোককে একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম আর কি! আর আপনার বাকী প্রশ্নগুলোরও উত্তর

দিই। আপনি আরাম করে বসে থাকুন।"

সেই আমেরিকান সদস্য অবাক হয়ে বললেন, "আমার বাকী প্রশ্ন! কই আর তো কোন প্রশ্ন আমি করিনি। ওঃ হো, বুঝতে পেরেছি। আপনারা তো টেলিপ্যাথিতে ওস্তাদ! বেশ, বলুন, শোনা যাক আপনার কথা।"

এই বলে তিনি বসে পড়লেন এবং ম্যাগমাস্ আবার বলতে লাগলেন, "আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আপনাদের এই পৃথিবীতে কয়েকবার দিনের আলো ওরকম অবিশ্বাস্যভাবে নিভে গেছল কি করে এবং অতগুলো মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল কিভাবে? কেমন, তাই না? এর জবাবে বলছি, এই ব্যাপারটা আমরা করেছি এমন একটা প্রক্রিয়ার সাহায্যে যাকে আপনারা 'ইন্‌টেন্‌সিফায়েড পোলারাইজেশন্ অভ লাইট' বলতে পারেন। আপনাদের বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রেরা যেরকম পোলারাইজেশানের সঙ্গে পরিচিত আমাদের তৈরী পোলারাইজেশান্ তার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। আপনাদেয় বায়ুমণ্ডলে আমাদের স্পেশ্‌শিপ্‌কে ভাসমান রেখে বিশেষ ধরনে তৈরী শক্তিশালী পোলারাইজার যন্ত্র দ্বারা সূর্যের আলোকে আমরা সম্পূর্ণভাবে আটকে দিয়েছিলাম আমাদের নির্বাচিত পৃথিবীর কিছু অংশের ওপর। এর ফলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ছেয়ে যেত সেই জায়গাটা। তখন আমাদের স্পেশ্‌শিপ সেই জায়গায় নামিয়ে পছন্দমত ধরে নিতাম। স্পেশ্‌শিপ থেকে সেই জায়গার মানুষদের ওপর 'প্যারালাইজিং রে' ফেলে তাদের অবশ-অসাড় করে ফেলা হত বলে তাদের নিয়ে স্পেশ্‌শিপে তোলা কিছুমাত্র অসুবিধে হোত না। আমাদের লোকেদের চোখে চশমা থাকায় ঐ সূচীভেদ্য অন্ধকারে দেখারও কোন অসুবিধে ছিলো না। এই ভাবে গোড়ার দিকে আমরা কাজ হাসিল করেছিলাম।"

তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ম্যাগমাস্ আবার থামতেই পূর্বোক্ত সেই ভারতীয় সদস্য বললেন, "মার্জনা করবেন, ক্যাপটেন্ ম্যাগমাস্! আমি একটা অপ্রিয় সত্য বলছি। আমাদের সভ্যতার তুলনায়

আপনাদের সভ্যতা অনেক বেশী উন্নত একথা আপনি খানিক আগে বলেছেন। তাই যদি হয় তাহলে কতকগুলি নিরীহ নরনারীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অপহরণ করা কি আপনাদের সেই উন্নত সভ্যতার অঙ্গ ? আপনারা কি ভেবে দেখেননি এরকমভাবে মানুষ চুরি করে নিয়ে গেলে আমাদের পৃথিবীর কত সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়ে যেতে পারে ? আপনাদের ঐ কাজের মধ্যে সভ্যতার স্থান কোথায় আমরা বুঝে উঠতে অপারগ। আমার রূঢ় অথচ সভ্যভাষণের জন্যে পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

ভারতীয় সদস্যের এই উক্তিতে সভাগৃহে উঠলো একটা চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন-ধ্বনি। প্রায় সকলেই খুসী হয়েছেন বোঝা গেল। কিন্তু কেউ কেউ আশঙ্কা করলেন ম্যাগমাস্ এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু না অনর্থ ঘটান!

কিন্তু তাঁদের এই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত করে ম্যাগমাস্ স্মিতমুখে বললেন, "মাননীয় সদস্য মহাশয় রেগে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। তাঁর এই রাগ স্বাভাবিক। আমরা প্রথমে যে ভাবে আপনাদের পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের প্রাথমিক ঘাঁটি হার্মিসে সেটা আপনাদের পার্থিব সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করলে ঘোরতর অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আমরা মনে করি অধিক সংখ্যার জন্যে অল্পসংখ্যার ক্লেশস্বীকারে কোন অন্যায় হয় না। স্বর্গের মতো সুখে শান্তিতে ভরা আমাদের গ্রহে ভবিষ্যতে বাস করবে আপনার পৃথিবীরই মানুষের বংশধর। ভেবে দেখুন কতো সুখে থাকবে তারা। সুতরাং তাদের সুখের জন্যে এখন যদি আপনাদের কিছু মানুষ দুঃখ পায় তা'হলে তা'তে অন্যায় কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না। আর এসব আমরা করছি আপনাদেরই বংশধরদের সুখের জন্যে। আমাদের জীবদ্দশায় কিছু তৃপ্তি পাওয়া ছাড়া আর আমাদের কি লাভ ? যাইহোক, আপনাদের সহযোগিতা পাবার জন্যে আমরা আমাদের কাজের ধারা পরিবর্তন করেছি। যাঁরা স্বেচ্ছায় আমাদের গ্রহে

[এরপর ১৭৫ পৃষ্ঠায়]

কৃত্রিম ভ্রূণ যদি তৈরী করা যায়, তবে তাকে ভয় করবার কি আছে কিছু ?

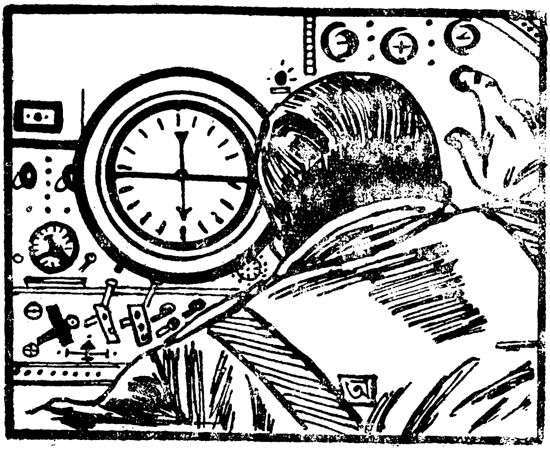

চূড়ান্ত উত্তর

শ্রীধর সেনাপতি

পৃথিবী জুড়ে আণবিক যুদ্ধ হয়ে গেছে একটা। অবলুপ্তি ঘটে গেছে সমগ্র মানবজাতির এক বিরাট অংশের! জীবিতদের মধ্যে অনেকেরই দেহ বিকৃত। বিকলাঙ্গ! মানবশিশু জন্মগ্রহণ করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রবারের মত স্থিতিস্থাপক! স্বাভাবিক দুটো চোখ যথাস্থানে তো আছেই, এছাড়া কারো কারো একটা অতিরিক্ত চোখ রয়েছে কপালের মাঝখানে!

মানবসমাজের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর তমসাঘেরা দিন। অসহনীয় যন্ত্রণায় অসহায় হয়ে আর্তনাদ করছিল তারা। নবজাত বিকলাঙ্গ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছিল। যাতে তারা ভবিষ্যতে তাদের প্রতিনিধি

পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে না পারে। মানুষের অনশনক্লিষ্ট কৃশ মৃতের মত মুখগুলো আতঙ্কে জঠরজ্বালায় বীভৎস হয়ে রয়েছে। তবুও সমস্তকিছুকে অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামকে কোনমতেই থামিয়ে রাখা যায় কি? মানুষকে বাঁচতে হবে। রক্তের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল অহরহ…

ডাঃ জয়ন্ত শর্মা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গেটে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করলেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল সেই পরিচয়পত্র। পরিচয়পত্রের সঙ্গে আঁটা ফটোর সঙ্গে ওঁর চেহারা দেখে মিলিয়েও নেওয়া হল। অবশেষে খুশী হল ওরা।

ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন ডাঃ জয়ন্ত শর্মা।

পরিচয়পত্রটা ওঁকে ফেরৎ দেওয়া হল।

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে উনি এক অপ্রশস্ত ঘোরালো প্যাসেজের মধ্যে এসে পড়লেন। উভয় পার্শ্বের দেওয়াল আয়নার মত ঝক্‌মক্ করছে।

দু'জন জুনিয়র বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল ওখানে। তাঁরা ওঁকে আরো এগিয়ে যেতে বললেন। ওঁর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র। ইলেকট্রনিক আলোর একটা আবছা দ্যুতি যন্ত্রটা ঘিরে বিরাজ করছিল। বৈদ্যুতিকশক্তির প্রকাশ ঘটছে যন্ত্রটির নানান সূক্ষ্ম অংশে।

রবারের চাকালাগানো একটা লম্বা এক্স-রে ক্যামেরা ডাঃ জয়ন্ত শর্মার কখনো মাথার দিক থেকে, কখনো বা পাশে গিয়ে পটাপট ছবি তুলতে সুরু করে দিল! ওঁর পোষাকের মধ্যে থেকে তেজস্ক্রিয়শক্তির কোন চিহ্ন ধরা যায় কিনা, তার জন্যে তন্ন তন্ন করে ক্রিয়া সুরু করে দিল একটা রে-কাউণ্টার।

অবশেষে জনৈক জুনিয়র বিজ্ঞানী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন ওঁর কাছে।

—'আপনাকে এখানে আর আটকে রাখব না, স্যার।' বিজ্ঞানীটি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন যে, সবদিক দিয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এসব করতেই হয়।'

বিজ্ঞানীটি মেশিনের একটা বোতাম টিপলেন। কতকগুলো সাঙ্কেতিক আলো জ্বলল। নিভল, আবার জ্বলে উঠল। অবশেষে একটা চাপা গর্জন করে মেশিনটি একটা কার্ড বের করে দিল একস্থান দিয়ে। পাৎলা সাদা রঙের প্ল্যাষ্টিকের কার্ড। কার্ডটির বুকে রয়েছে কতকগুলো ডট্ আর চৌকো ছিদ্রের সমষ্টি।

'সব ঠিক আছে, স্যার।' কার্ডটিকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন বিজ্ঞানীটি, 'আপনি এখন ভেতরে যেতে পারেন।'

দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন ডাঃ শর্মা। সামনেই একটা কালোরঙের ষ্টীলের দরজা। কমলারঙের একটা অস্বচ্ছ আলো নির্গত হচ্ছিল ওই দরজা থেকে। ওঁর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেমন নিজেই উন্মুক্ত হয়ে গেল, তেমনি আবার ওঁর পিছনে বন্ধও হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

দেহে সামান্য একটু উত্তেজনা অনুভব করছিলেন ডাঃ শর্মা। নানা প্রকার-জটিল যন্ত্রজালের স্পর্শ বাঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উনি অগ্রসর হতে লাগলেন। যেন একটা বন্দী দানবের নিরলস চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন স্থানটাকে পূর্ণ করে রেখেছে।

রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রেমমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এখানে।

ডাঃ শর্মার উদ্দেশ্যের কথা মন দিয়ে শুনলেন উনি। পরীক্ষায় যদি সফলকাম হওয়া যায়, তাহলে আবার নতুন করে সুরু হবে। মানুষকে তা'র মনুষ্যত্ব বিকাশের দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হোক।

—'আবার সুরু? কিন্তু—সেটা অসম্ভব।' চোখেমুখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন ডাঃ মূর্তি, 'ডাঃ শর্মা, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

ডাঃ শর্মা উত্তর দিলেন শান্ত গলায়, 'সত্যি কি সম্ভব নয়? আমি স্বীকার করছি, অসুবিধে আছে অনেক। কিন্তু সেগুলো যে অতিক্রম করা যাবে না, এমন কোন প্রমাণও নেই। গত কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে আমি বহু চিন্তা করেছি, ডাঃ মূর্তি। আপনাকে আমি কথা দিতে পারি। আমি যা' দেখেছি এবং শুনেছি, তা থেকে আমার এধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, একাজ করা শুধু সম্ভবই নয়, করা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

দীর্ঘ সময়ের স্তব্ধতা নেমে আসে ওঁদের দুজনকে ঘিরে।

অবশেষে প্রায় ফিসফিস করে বলেন ডাঃ প্রেমমূর্তি, 'ডাঃ শর্মা, আপনি জীবন সৃষ্টি করার মনস্থ করেছেন—নকলভাবে। কিন্তু সেটা কী জিনিষে পরিণত হবে, কেউ বলতে পারে না!'

ডাঃ শর্মা ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করছিলেন। জুনিয়র বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে যে সাড়া পাওয়া যাবে না, এ ধারণা উনি পোষণ করতেন। উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং দূরদর্শিতার অভাব এখনও ওঁদের কাটেনি। কিন্তু এখানে, এই রিসার্চ ষ্টাফদের মধ্যে থেকে সমালোচনা আশা করলেও, বিনা পরীক্ষাতেই যে ওঁর এই আইডিয়ার অপমৃত্যু ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা ডাঃ শর্মার মনে উদয় হয়নি আগে। ডাঃ মূর্তি কি ওঁর অনুরোধ একেবারেই নস্যাৎ করে দেবেন!

কিন্তু ওঁকে প্রায় চমকে দিয়ে ডাঃ মূর্তি বললেন, 'প্রাথমিক কাজের ছক নিশ্চয়ই তৈরী করে এনেছেন। বার করুন। দেখা যাক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ মূর্তিকে রাজি করাতে সক্ষম হলেন ডাঃ শর্মা।

—'যাইহোক, আপনার কাজের পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি, ডাঃ শর্মা।' ডাঃ মূর্তি বললেন, 'তবে, এধরনের এক্সপেরিমেণ্টের উপযুক্ত সময় এটা নয় বলেই আমার মনে হয়। এ চেষ্টা আপনার আগে আর কেউ করেনি। বংশগত প্রকৃতি নির্দেশক ধর্ম বা গুণ বহন করে যে ক্রোমোজোম, তার মধ্যে নিউক্লিয়াসের বিন্যাস-বিভাজন নতুন করে ঘটাতে হবে আপনাকে। একাজে, সুতরাং সময়েরও প্রয়োজন। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যাটা ভেবে দেখুন! যাইহোক, আমি আপনাকে সুযোগ দিলাম। কিন্তু একটি শর্ত চাপানো রইল। যে প্রেসারট্যাঙ্কের মধ্যে আপনি এক্সপেরিমেণ্ট করতে যাচ্ছেন, সেটার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় এমন এক পদ্ধতি সংযুক্ত থাকবে, যার সাহায্যে প্রয়োজন দেখা দিলেই নিমেষের মধ্যে আপনার সৃষ্ট প্রাণীটিকে ধ্বংস করে ফেলা যেন সম্ভব হয়। আর, আপনার এক্সপেরিমেণ্টের অগ্রগতির রিপোর্ট মাঝে মাঝে যেন এসে পৌঁছায় আমার কাছে। আপনার সৃষ্টিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা অঙ্কুরেই সেটাকে বিনষ্ট করে ফেলার বিচার ছেড়ে দিতে হবে আমার ওপরে! রাজি ?"

—"ধন্যবাদ, ডাঃ মূর্তি।" ক্ষণেক ইতস্তত করে বলেন ডাঃ শর্মা, "আপনার সর্তেই আমি রাজি !"

প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন করতেই চারপাঁচটা দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

আভ্যন্তরিক যন্ত্রপাতিকে ঘিরে রিটর্টের দীর্ঘ সারি সাজানো হয় ল্যাবরেটরীর মধ্যে। সব কিছু বায়ুশূন্য। উত্তাপ এক সহস্রাংশ ডিগ্রিতে নামিয়ে এনে নিয়ন্ত্রিত করা হল। এক বিশেষ ধরনের বার্ণার থেকে পরিমিত উত্তাপ পরিবেশনের এমনই ব্যবস্থা গড়ে উঠল, যার সাহায্যে ক্রোমোজোম অণুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে যেন কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি না ঘটে।

ডাঃ শর্মার কাজে সাহায্যের জন্যে সহকারীরূপে ডাঃ গুপ্ত এগিয়ে আসেন।

বিভিন্ন স্তরে কাজ ভাগ হয়ে যায়। প্রথমতঃ ওঁদের বহুকোষাত্মক প্রোটিন সংযোগ করার প্রয়োজন, যা থেকে পরে পৃথক পৃথক ক্রোমোজোম সৃষ্টি হতে পারবে। অতঃপর সেই ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াসের দেওয়াল ভেদ করিয়ে সন্নিবিষ্ট করে গঠন করে তোলা হবে এক-একটি সম্পূর্ণ কোষ। এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সেই কোষ একটা স্থির তাপমানের মধ্যে থেকে যখন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলবে, তখন তার প্রতিক্রিয়াটা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে যেতে হবে।

একেবারে বাঁধা ছকে এগিয়ে চলছিল ওঁদের কাজ।

ক'টা মাস অতিবাহিত হতে না হতেই বাধার সম্মুখীন হলেন ওঁরা। দেখা গেল বায়ুশূন্য অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আণবিকের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ওদের এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে কোন ফাঁকে এসে পড়েছে।

বিশাল রিটর্টের মধ্যে স্বচ্ছ এক তরল পদার্থে ভাসমান অদ্ভুত আঠাল জিনিষটার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ শর্মা। জিনিষটা যে জীবিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনি লক্ষ্য করেছিলেন, রিটর্টের গায়ে তরল পদার্থটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গে ভেঙে পড়ছিল। সে-তরঙ্গ জিনিষটার জীবনস্পন্দন সঞ্জাত। খাদ্যের একটা সূক্ষ্ম কণা যখন রিটর্টের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তখন সেটাকে লক্ষ্য করে জিনিষটার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা শুঁড়ের মত অঙ্গ।

—'কোথায় আমাদের ভুল হল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধলেন ডাঃ গুপ্ত, 'ভাবতে ভাবতে মাথাটা যেন ঠিক রাখতে পারছি না।'

—'ভুল যে কোন জায়গায় হতে পারে, ডাঃ গুপ্ত। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন ডাঃ শর্মা, 'হয়তো সংযোজক ট্যাঙ্কের মধ্যে বিকিরণ প্রবেশ করেছে কোন ফাঁকে। তারই ফলে এই বিকৃত পরিবর্তন। পুনরায়

নতুন করে আরম্ভ করার আগে এবিষয়টির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যাই হোক এখন জিনিষটা আকারে আরও বেড়ে ওঠার আগেই ওটাকে নষ্ট করে ফেলব।'

রিটর্টের মধ্যে ফোঁটায় ফোঁটায় অ্যাসিড ফেলতে লাগলেন ডাঃ শর্মা। আঠাল জিনিষটা নিঃশব্দে একটু মোচড় খেল। সবুজ জেলীর মত ওটার দেহ থেকে বেরিয়ে এল ক'টা শুঁড়। অ্যাসিডের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল ওটা। অবশেষে ওটার দেহ অল্পে অল্পে ক্ষরিত হয়ে তরল পদার্থটির সঙ্গে গেল মিশে।

সেদিকে দৃষ্টি রেখে ডাঃ গুপ্ত বললেন, 'ঈশ্বর জানেন, জীবটা পরিণতি লাভ করলে পৃথিবীতে ওর পরিচয় কি হত। ডাঃ শর্মা আমরা তাহলে আবার নতুন করে আরম্ভ করব?'

—'নিশ্চয়ই।' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ডাঃ শর্মা, 'প্রথম প্রচেষ্টায় অসফল হলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে যে সফল হব না, এ কথা আমি স্বীকার করি না। আবার নতুন য়্যাপারেটাস সাজান, ডাঃ গুপ্ত।'

এর পর যতই দিন যেতে লাগল ডাঃ শর্মা যেন বিচলিত হয়ে উঠতে লাগলেন। সুরুতেই একটা সৃষ্টির উন্মাদনা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে উনি ওঁর সাধনায় মগ্ন ছিলেন এতদিন ধরে। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল, নিজের ওপরে বিশ্বাসটা যেন আর অটুট থাকতে চাইছে না। ডাঃ প্রেমমূর্তির আশংকাই কি শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হবে?

যান্ত্রিক ভ্রূণাধারের গায়ে সন্ধানী-ছিদ্রের ওপরে চোখ লাগান ডাঃ শর্মা। চমকে ওঠেন! মুখ তুলে তাকান ডাঃ গুপ্তের মুখের দিকে। তারপর আবার সন্ধানী ছিদ্রে চোখ রেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'ভ্রূণটাকে স্বাভাবিক বলেই তো এখন মনে হচ্ছে, ডাঃ গুপ্ত! দেখুন, দেখুন!'

ভ্রূণটাকে লক্ষ্য করতে থাকেন ডাঃ গুপ্ত। পরিষ্কার গলায় বলেন,

'হ্যাঁ। প্রভাবটা কাটিয়ে ওঠা গেছে নিশ্চিতভাবে। আর বোধ হয় ভয় নেই।'

ডাঃ শর্মার মনটা মুহূর্তে সতেজ হয়ে ওঠে আবার। রক্তের মধ্যে একটা দুরন্ত খুশীর বন্যা অনুভব করতে থাকেন উনি। একটা জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা উনি আজ। ভবিষ্যতে সেই প্রাণী তার বুক ভরে নিশ্বাস টানবে, ঘুরবে ফিরবে, চিন্তা করতে পারবে। কিন্তু—ডাঃ শর্মা মনে মনে বলেন, আমার দায়িত্ব এখন থেকে অসম্ভব রকম বেড়ে উঠল বোধ হয়।......

ডাঃ শর্মা ধীরপদে করিডর অতিক্রম করলেন। ওঁর সামনে একটা ষ্টীলের দরজা। বন্ধ। পাশে বোতাম টিপলেন। দরজা উন্মুক্ত হল। অনুজ্জ্বল আলোয় ভরা কক্ষ। ভেতরে উনি প্রবেশ করলেন। ওঁর পিছনে অল্প একটু শব্দ তুলে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

'আসুন, ডাঃ শর্মা।' আহ্বান জানালেন ডাঃ প্রেমমূর্তি।

ডাঃ শর্মা আসন গ্রহণ করে বললেন, 'যে প্রাণীটিকে আমরা সৃষ্টি করছি, সেটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই, ডাঃ মূর্তি! আমার মনে হয়, সেটা তার দেহে কোনরকম বিকৃতি না নিয়েই হয়তো পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।'

—'অর্থাৎ' ডাঃ প্রেমমূর্তি বলে ওঠেন, 'আপনার সৃষ্ট প্রাণীটি একটা মানুষ হবে। আর—শুধু তাই নয়, মানবজাতির সমস্ত গুণেরও অধিকারী হবে সেই মানুষটি। তাই না?'

—'হ্যাঁ' ডাঃ শর্মার গলার স্বর এবার আত্মপ্রত্যয়ে খুবই দৃঢ়, 'আত্মধ্বংসকারী বীজ এখনও সেটার মধ্যে রয়েছে, একথা সত্যি, মানবজাতির পতন সম্ভাবনা সেটার মধ্যে থাকলেও তা' শেষবারের মতই আছে, ডাঃ মূর্তি। সর্বপ্রকারে সে সম্ভাবনাকে আমরা দূরীভূত করবই।'

—'সেটাকে চিরদিনের মত দূর করার পথ আছে বলে আপনি মনে করেন?'

—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না, ডাঃ মূর্তি। প্রাণীটির মানসিক দিকটায় আমরা বেশী করে নজর দেব। খর্ব করে দেব একদিক দিয়ে। আমার সহকারী ডাঃ গুপ্ত একজন অভিজ্ঞ এণ্ডোক্রাইনোলজিষ্ট। ভ্রূণটার কোনরকম ক্ষতি না করে ওই দোষটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবার উপায় তিনি নিশ্চয়ই বার করতে পারেন।'

যুক্তিটা মনঃপুত হয় ডাঃ মূর্তির। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেন, 'বেশ, তা' না হয় মানলাম। কিন্তু—'

'আমি আরো চিন্তা করেছি. ডাঃ মূর্তি।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন ডাঃ শর্মা, 'থাইরয়েড্ আর পিনিয়েল গ্ল্যাণ্ডগুলো পর্যাপ্তভাবে বর্ধিত হয়ে উঠলেই প্রথমে সেগুলোর ওপরে নজর দেওয়া হবে। একথা আপনার অজানা নেই যে, মানুষের দেহের অভ্যন্তরের প্রবাহিকানল-বিহীন গ্ল্যাণ্ডগুলো শুধু দেহকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, মনকেও করে। চড়াও হয়ে আক্রমণ করার প্রবণতাধর্ম প্রাণীটার মধ্যে বিকাশলাভ করার প্রথম স্তরেই আমরা সেটাকে বাধা দিতে পারব। আমার ধারণা, হরমোনে'র সঠিক পরিমিতি দ্বারা একাজ করা সম্ভব।'

ডাঃ মূর্তি বলেন, 'আপনাকে আমি নিরুৎসাহ করছি না, ডাঃ শর্মা। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার এ চেষ্টার দ্বারা ঐ ভ্রূণটিকে আপনি হয়তো হত্যা করে বসবেন। অথবা, হয়তো ওটার জ্ঞানবুদ্ধি আপনার দ্বারা হাজার গুণ বৃদ্ধিও হয়ে যেতে পারে। ওটার মন থেকে যুদ্ধ ও ধ্বংসের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথবা—'

গলার স্বর এবার নীচু হয়ে এল ডাঃ মূর্তির, 'অথবা আপনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যেটা হয়তো সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা নিজের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম। আর, যদি তাই হয়, সেটাকে তখন নিয়ন্ত্রিত করার কোন পথই পাব না আমরা।'

—'না, না। তেমন কিছু ঘটবে না। এ আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি?

—'তবু বলব, আপনি ভাবাবেগেই চালিত হচ্ছেন,' ডাঃ মূর্তি গম্ভীর ভাবে বলেন, 'যাইহোক, আপনার এক্সপেরিমেণ্ট আপনি চালিয়ে যান। কিন্তু আমার পূর্বসর্ত আশা করি আপনি ভুলে যাননি। আপনার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল রাখবেন মাঝে মাঝে।'

গোপন বিরক্তিতে ডাঃ শর্মার অন্তর যেন বিষিয়ে উঠতে চাইল। নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন। অতঃপর সংযত কণ্ঠে বললেন 'অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে খবর পাবেন।'

ডাঃ মূর্তির কাছ থেকে বিদায় নিলেন ডাঃ শর্মা। হাতে সময় অতি অল্প। কৃত্রিম ভ্রূণটি পূর্ণতার দিকে যথারীতি এগিয়ে চলেছে। করিডর পার হলেন উনি দীর্ঘ পদক্ষেপে। ব্যস্তভাবে ল্যাবরেটরীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

ডাঃ গুপ্ত কৌতূহলী হয়ে শুধলেন, 'কী খবর?'

প্রথমে একটি চেয়ারের কোলে নিজেকে সঁপে দিলেন ডাঃ শর্মা। সমস্ত দেহ জুড়ে যেন একটা ব্যথা অনুভব করছিলেন।

'—কাজ করে যান, তবে ডাঃ মূর্তির পূর্ব সর্তের কথা মনে রেখে। কোন রকম ত্রুটির লক্ষণ দেখা দিলেই প্রাণীটিকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।'

ভ্রূণাধারের সন্ধানীছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ভ্রূণটি বেড়ে উঠছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়া সুরু হয়ে গেছে ওটার দেহে। তবে সেগুলো এখন অত্যন্ত কৃশকায়, একটা পাত্‌লা স্বচ্ছ আবরণের ভেতরে অবস্থান করছে ভ্রূণটা। বিভিন্ন হরমোনপূর্ণ আধারের সারি ভ্রূণাধারটির সঙ্গে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে হরমোনগুলো সঠিক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করা যায়। এ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে ডাঃ গুপ্তর ওপরে। ফলে, ওঁর হাত স্থির থাকছে না কোন সময়ের জন্যে। কখনো এক ফোঁটা, কখনো দুফোঁটা —এমনি করে এখানে ওখানে হরমোন প্রয়োগ করে চলেছেন উনি!…

কিছুদিন পরে পুনরায় ডাঃ মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ শর্মা।

'আমাদের হিসেবে অনুযায়ী ভ্রূণের বহিরাবরণ আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে যাবে, ডাঃ মূর্তি।' বেশ গর্বের সঙ্গে ডাঃ শর্মা ঘোষণা করেন, 'এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনামত সবকিছুই করতে পেরেছি। প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকই। পিনিয়েল আর থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড দিয়েই সুরু করেছিলাম। সেইজন্যে আমরা আশা করি, ওর শারীরিক কার্য-কারক শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। কাউকে হঠাৎ চড়াও হয়ে আক্রমণ করার প্রবণতাধর্ম—মানুষের মধ্যে যা' স্বাভাবিক, এটার ভেতরে অঙ্কুরিত হতে পারে নি। ডাঃ গুপ্ত শেষ-বারের মত সেটা পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছেন এখন। আমি ফিরে গিয়েই ওঁর রিপোর্ট পাব। তবে কোন রকম ত্রুটি—'

ডাঃ শর্মা ওঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ষ্টীলের দরজা সশব্দে উন্মুক্ত হয়ে গেল। বাইরে থেকে একটা নীল আলোর প্রভা এসে লুটিয়ে পড়ল অধ্যক্ষের ঘরের মেঝের বুকে।

ডাঃ শর্মা চকিতে ঘাড় ফেরালেন। দেখতে পেলেন, দরজার ফ্রেমে আঁটা ডাঃ গুপ্তের দণ্ডায়মান মূর্তিটিকে। ওঁর সমস্ত মুখ জুড়ে আতঙ্ক আর বিস্ময়ের মিশ্রিত অভিব্যক্তি।

ডাঃ গুপ্ত এগিয়ে আসেন। একটা ভৌতিক উপলব্ধি উনি যেন ওঁর চোখ দুটোতে ধরে রেখেছেন।

—ভ্রূণাধারের জিনিষটায় প্রাণের একটা প্রবল স্পন্দন জেগেছে, ডাঃ শর্মা, 'এ ছাড়া নতুন কিছু বলার আছে আপনার?'

কোন রকম উত্তর আসে না ডাঃ গুপ্তর কাছ থেকে।

—'বলুন, ডাঃ গুপ্ত।' ডাঃ শর্মা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন কিছুটা, 'আপনি যেন ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

শুষ্ক হয়ে ওঠা ওষ্ঠ জিভ বুলিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ডাঃ গুপ্ত বলেন এবার, 'শেষবারের মত পরীক্ষা করে সন্ধানী-ছিদ্রে চোখ

লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভ্রূণাধারের ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, ডাঃ শর্মা।'

—'কণ্ঠস্বর!' হঠাৎ একটা শক্ পেয়ে ডাঃ শর্মার মাথার ভেতরটা যেন কয়েক লহমার জন্যে অসাড় হয়ে যায়। পরমুহূর্তে প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কার কণ্ঠস্বর? কীসের কণ্ঠস্বর? আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? কীসব যা-তা কল্পনা আপনার মাথায় বাসা বেঁধেছে, ডাঃ গুপ্ত?'

—'এ আমার কল্পনা নয়!' ডাঃ গুপ্তর কণ্ঠে এবার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, 'কয়েক বারই শুনেছি আমি। ভ্রূণাধারের ভেতর থেকেই উঠেছে। ভ্রূণটা শুধু জীবিতই নয়, সেটা চিন্তা করার ক্ষমতাও অর্জন করে নিয়েছে।'

—'অর্থাৎ বিপজ্জনক সৃষ্টি!' এতক্ষণে ডাঃ মূর্তি কথা বললেন, 'আপনাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এরই মধ্যে সেটা আর থাকতে চায় না। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম, ডাঃ শর্মা। এ রকম হতে পারে, আমি তো আশঙ্কা করেছিলাম। অতএব এ এক্সপেরিমেণ্ট্ এখানেই শেষ হোক। আপনাদের ওই সৃষ্টি ভবিষ্যতে যাতে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার নিতে না পারে, সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য হবে।'

লিভারটাকে শক্তমুঠিতে চেপে ধরলেন ডাঃ জয়ন্ত শর্মা। তাতে চাপ দিলেন। প্রেসার ট্যাঙ্কের মধ্যে কৃত্রিম ভ্রূণাধারে অ্যাসিড প্রবাহের শব্দ উঠল।

সন্ধানী-ছিদ্রে চোখ রাখলেন উনি শেষ বারের মত! দেখতে পেলেন, আকারবিহীন একটা কৃত্রিম মাংসপিণ্ড উগ্র অ্যাসিডের অবিরল প্রবাহের ঘূর্ণিপাকে পড়ে একটু একটু করে ক্রমশঃ তার অস্তিত্বটা হারিয়ে ফেলছে!*

---

* Roy Cosmic-এর Final Answer অবলম্বনে।

ঈথার থেকে মৃতব্যক্তির আত্মাশক্তিকে শুষে নিয়ে

এক প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল……

জীবন্ত ঈথার

সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

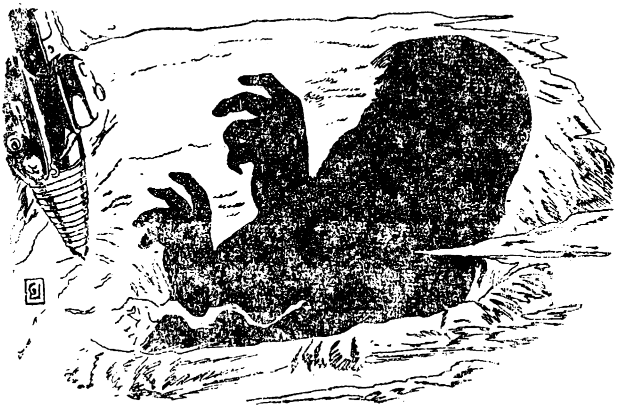

ডক্টর নিরঞ্জন সান্যালের ডায়েরীটা যে শেষ পর্যন্ত আমার হাতে এসে পৌঁছতে পারে কোন দিন কল্পনা করতে পারিনি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিরঞ্জন সান্যালের নাম জানেন না এরকম লোক ভারতবর্ষে হয়ত নেই। পৃথিবীর বিজ্ঞানবিদ মহলেও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। এহেন ডক্টর সান্যালের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠতার পর্যায়েই গিয়ে পৌঁছয়। এ সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে বলে, মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করতে পারি আমি।

ডক্টর সান্যাল অত্যন্ত অল্পভাষী। তিনি যাকে বলে একজন মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না মোটেই, তাই অনেকের সঙ্গে তার

আলাপ থাকলেও কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হতে পারেনি। এজন্য চারিদিকে ডক্টর সান্যালের একটা বদনামই ছিল বলা চলে। অথচ আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব বেশিদিনের নয় মোটেই, তবুও আমাকে তাঁর স্নেহধন্য হতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে ডক্টরকে অত্যন্ত রূঢ় আর গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও অন্তর ছিল তার স্বচ্ছ, নির্মল জলের মতোই। সেই জলে অবগাহন করার গৌরব বোধ হয় সারা বিশ্বে একমাত্র আমারই হয়েছে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ডক্টর সান্যালের আত্মীয়স্বজন বলতে একরকম কেউ ছিল না। তিনি অকৃতদার। একমাত্র ভাগ্নে শ্যামলই ছিল তার পার্থিব যোগসূত্র। তাকে তিনি স্নেহ করতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র শ্যামল, মাঝে মাঝেই তাকে ঐ বাড়ীতে দেখতে পেতাম।

ডক্টর সান্যালের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সামান্য এক ঘটনার মধ্য দিয়ে। বাড়ী থেকে ডক্টর খুব সামান্যই বের হতেন। বাড়ীর একান্তে তার নিজস্ব ল্যাবরেটরীতেই তার সব সময় কেটে যেত। ঐ ল্যাবরেটরী ছিল ডক্টর সান্যালের প্রাণ। সাধারণত ওখানে কারও প্রবেশ করার হুকুম ছিল না। এমনকি শ্যামলেরও নয়। এ বিষয়ে এক অদ্ভুত ছেলেমানুষী একগুঁয়েমী ছিল তাঁর। ল্যাবরেটরীটা ছিল ডক্টর সান্যালের প্রাণ মন ধ্যান জ্ঞান সব কিছু। মাঝে মাঝেই তিনি ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ করে কাজ করে চলতেন, স্নানাহার করারও সময় থাকত না। বাড়ীর চাকর বৃদ্ধ রাম প্রভুকে ভাল করেই জানত, সেও কোন সময় বিরক্ত করত না।

পরিচিত জনের মধ্যে একমাত্র আমিই বোধ হয় ডক্টর সান্যালের ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে পেরেছি। তাও আমাদের পরিচয়ের অনেক দিন পরে। কেন যে ডক্টর তার গবেষণাগারে কাউকে ঢুকতে দিতেন না জানি না। ল্যাবরেটরীতে ঢোকার পরেও আমি ধারণা করতে পারি নি।

একদিন এক রেঁস্তোরায় ডক্টর সান্যালের সঙ্গে আমার আলাপ। ডক্টর সান্যালের মত লোক কেন যে ঐ রেঁস্তোরায় ঢুকেছিলেন আজও সেটা আমার কাছে এক রহস্য। আমার সামনের টেবিলে বসেই আনমনে ডক্টর সান্যাল একখানা ফাউল কাটলেট খাচ্ছিলেন। আমি তাকে আগেও দেখেছি। তাই চিনতে অসুবিধা হয়নি। মজা হল বেয়ারা বিল দিয়ে পয়সা চাইতেই। ডক্টর সান্যাল এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কোন পয়সা পেলেন না। বুঝলাম ভুলে কোন পয়সা আনেন নি উনি। আমি বলে উঠলাম কিছু যদি মনে না করেন, আমি বিলটার দাম দিতে পারি, ডক্টর।'

ডক্টর সান্যাল আনন্দে গদ গদ হয়ে বললেন, 'উঃ বাঁচালেন। কি ভুল দেখুন, কোন টাকা পয়সাই সঙ্গে আনি নি।'

বেয়ারাকে পয়সা দিতে দিতে বললাম, 'তাতে কি, এ রকম ভুল তো সকলেরই হয়।'

ডক্টর এবার আমাকে একদিন তার বাড়ী যেতে অনুরোধ করলেন। অতএব একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ করতে কার না ইচ্ছা হয়। আর আমিও যখন বিজ্ঞানের ছাত্র তাই একদিন সুযোগ মত ডক্টর সান্যালের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

ডক্টর আমাকে পেয়ে হাতে যেন চাঁদ পেলেন। তার অভ্যর্থনার ঘটায় লজ্জা পেলাম। সামান্য ঐ ঘটনায় ডক্টর সেন আশাতীত আনন্দ পেয়েছেন মনে হল। তার ছেলেমানুষী দেখে ভালো লাগল। বুঝলাম ডক্টর একেবারে শিশুর মতই সরল। দেখলাম তিনি নিজ হাতে চা করে খান। আমাকেও তাই খাওয়ালেন আনন্দের সঙ্গে। তারপর নানা আলোচনা করতে লাগলেন। এর পর এক সময় ডক্টরের ভাগ্নে সান্যাল এলে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এর পর বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ডক্টর বার বার আমাকে বলে দিলেন সুযোগ পেলেই যেন আবার আসি।

একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কাজে বার বার বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না মনে করে কিছুদিন যাইনি। এরপর একদিন এক খানা চিঠি এসে হাজির। ডক্টরকে আমার ঠিকানা জানিয়েছিলাম। ডক্টর অনুযোগ করেছেন আমি অনেকদিন যাইনি বলে। চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি।

তখনও পর্যন্ত ডক্টর সান্যালের গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। তবে শুনেছিলাম তিনি গ্রহান্তরে জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নতুন মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করছেন। ডক্টরের সঙ্গে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার সেদিন আলোচনাই হয়নি। মনে হয়েছিল ইচ্ছা করেই ডক্টর ওটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ডক্টর চিঠি পেয়ে সেদিন আবার তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। ডক্টর আবার নানা গল্পে মেতে উঠলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা এইভাবে কাটানোর পর বিদায় নিলাম সেদিন।

এরপর ডক্টর সান্যালের বাড়ীতে ঘন ঘন যেতে শুরু করলাম। অদ্ভুত ভালো লাগত ডক্টরের সঙ্গ নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে যেতাম।

সেদিন ছিল রবিবার। হাতে কোন কাজ ছিল না। আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছড়াছড়ি। যে কোন মুহূর্তেই বোধ হয় বৃষ্টি আসতে পারে। সন্ধ্যার আর বেশি দেরী নেই। ভাবলাম ডক্টর সান্যালের সঙ্গে সময় কাটানোই ভাল। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে।

ডক্টর সান্যালও যেন আমারই অপেক্ষায় ছিলেন। আমাকে দেখে একরকম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। চা পানের পর বললেন 'চল, আমার ল্যাবরেটরীতে। ওখানে তোমাকে এক নতুন গল্প শোনাব।'

ডক্টর যে কখন আমাকে 'তুমি' বলতে সুরু করেছেন টের পাইনি। এটুকু বুঝতাম আমার সান্নিধ্য তিনি ভাল বাসেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আমাকে পেলে।

ল্যাবরেটরীতে সেই প্রথম ঢুকলাম। বেশ সুন্দর সাজানো এক-খানি ঘর। নানারকম অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রপাতিতে ভর্তি ঘরখানা। এ সব যন্ত্রপাতি আমার অচেনা। অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ডক্টর আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, 'কি দেখছ? এসব যন্ত্রপাতি আমার তৈরী। পৃথিবীর কোন ল্যাবরেটরীতে পাবে না।' তারপর একটা যন্ত্রের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন সস্নেহে, 'এঁরাই আমার সন্তান, এরাই প্রাণ।'

কোন কথা না বলে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

ডক্টর এবার একটা চেয়ারে বসলেন আর আমাকেও বসতে বললেন। তারপর বললেন 'যে জন্য তোমাকে ডেকেছি শোন। আজ তোমাকে এক নতুন কথা শোনাব। ম্যাটারের কথা তুমি জানো, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র। Matter is indestructible. ম্যাটারের ধ্বংস নেই, তাই না?'

বললাম 'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে নিশ্চয়ই জানো শক্তিরও পরিবর্তন আনা যায়। যে কোন শক্তিকে অন্য শক্তিতে পরিবর্তিত করা সম্ভব।'

'হ্যাঁ, এ তো বিজ্ঞানের মূল কথা,' বললাম।

'আত্মার ব্যাপারেও একথা খাটে' বললেন ডক্টর।

'তার মানে?'

'মানে আত্মাও অবিনশ্বর' ডক্টর বললেন।

'এ আমাদের শাস্ত্রের কথা, বললাম।'

'না, বিজ্ঞানেরও কথা। আমি প্রমাণ করতে চাই।'

বুঝতে পারলান না ডকটর পাগল হয়ে গেলেন না কি। এর পরই ডকটর সান্যাল চুপ করে গেলেন। আর কোন কথা বলতে চাইলেন না। এর কিছুক্ষণ পরে আবার ডকটরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এরপর কোন বিশেষ কাজে কোলকাতার বাইরে যেতে হয়

আমাকে। প্রায় একমাস ডকটরের কোন খোঁজ রাখতে পারিনি। চিঠি লিখেও তাঁকে বিরক্ত করতে চাইনি।

কোলকাতায় ফিরেই পেলাম একখানা চিঠি। সলিসিটর রায় এণ্ড রায়ের নাম লেখা খামে। চিঠিটা খুলে পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। রায় এণ্ড রায় কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার শচীন রায় অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন এই চিঠি নিয়ে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। রায় এণ্ড কোম্পানীর নাম কোনদিন শুনিনি। কি কারণে তাঁরা ডাকতে পারেন বুঝলাম না। রায় এণ্ড রায়ের অফিসে পরদিন হাজির হলাম চিঠি নিয়ে। শচীন রায় অফিসে ছিলেন। আমাকে খাতির করে বসালেন। তারপর বললেন, 'ডকটর নিরঞ্জন সান্যালের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'ডকটর সান্যাল? তাঁর কি হয়েছে?' একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার কালো ছায়া খেলে গেল মনের মধ্যে।

'সেটা আমরাও জানি না। শুধু আমাদের উপর আদেশ দেওয়া আছে এক মাসের মধ্যে কোন খবর না দিলে এই ডায়েরীটা যেন আপনাকে ডেকে এনে দিই। এই নিন সেই ডায়েরী'

যন্ত্রচালিতের মত হাত পেতে নিলাম সুন্দর চামড়া বাঁধানো একখানা মাঝারী আকারের ডায়েরী।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী এলাম ডায়েরীটা নিয়ে। ভাবলাম একবার ডকটর সান্যালের কি হল। তিনি কি কোলকাতায় নেই তাহলে। এভাবে ডায়েরী দেবার মানে কি হতে পারে!

ভাবতে ভাবতে ডায়েরীটা খুলে ধরলাম।

বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে:

১লা জানুয়ারী: প্রিয়তোষ, এ ডায়েরী যদি তোমার হাতে পড়ে তাহলে বুঝবে আর কোনদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এ ডায়েরী আমি বেঁচে থাকলে আমার কাছে ফিরে আসবে না হলে।

সেদিন তোমাকে ম্যাটারের তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছিলাম। বলেছিলাম আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা অজর অমর। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিশ্বাস করতে পারোনি। সাধারণ ভাবে না পারারই কথা। আমার গবেষণার বিষয় আমি কাউকে বলি নি। আজ তোমাকে জানাতে চাই। না হলে আমার মনে শান্তি আসবে না। আমার গবেষণায় আমি সাফল্য লাভ করি না করি আমার আনন্দ এইটুকুই যে আমি এক নতুন দিগন্তের সন্ধানেই আত্ম বিসর্জন দিতে পেরেছি। যে গবেষণায় আমি মেতেছি সে গবেষণা অবিশ্বাস্য আর বিপজ্জনক তো বটেই। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই, তোমার উপরেই সে গবেষণার ফল প্রয়োগ করব ভেবেছিলাম। তোমার সৌভাগ্য তুমি ঠিক সেই মুহূর্তেই কোলকাতার বাইরে চলে গেলে। শ্যামলও বাইরে চলে গেছে। আমার আর দেরী করার উপায় ছিল না। অনেক দেরী করে ফেলেছি। শরীরও খারাপ হয়ে পড়েছে। যা করার, দু'এক-দিনের মধ্যেই করতে হবে, তাই মনস্থির করে ফেললাম শেষ পর্যন্ত। আমার নিজের ওপরেই ঐ পরীক্ষা করব। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

তোমাকে বলেছি ম্যাটারের বিনাশ নেই। আত্মাও তাহলে একটা ম্যাটার। মৃত্যুর পর তাহলে সে ম্যাটার কোথায় যায়, নিশ্চয়ই ধ্বংস হতে পারে না। না কখনই না। তাহলে?

তুমি জানো বাতাসে ভরে আছে ঈথার তরঙ্গ। ঐ তরঙ্গের মধ্যেই আছে যত রহস্য। আত্মা তাহলে মিশে যায় ঐ ঈথার তরঙ্গের আবর্তে। এতে আমার সন্দেহ নেই। মানুষের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হতে পারে, আর হয়ে যায়, আত্মা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এ শাস্ত্রের কথা নয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমি প্রমাণ করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গবেষণায় আমি সাফল্যলাভ করবই।

আমি এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। সেই যন্ত্রের সাহায্যে ঈথার তরঙ্গ ধরে পরীক্ষা করতে পারি আমি। ঈথার তরঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র শব্দ নয়। মানুষ আর প্রাণীর আত্মারও অস্তিত্ব আছে।

আমি চেয়েছিলাম সদ্যমৃত কোন আত্মার সাহায্যেই এই পরীক্ষা চালাতে। কোন মানুষকে তাই হত্যা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম ঐ শক্তির অস্তিত্ব। ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত লোক পাইনি এতদিন। শ্যামলকে মেরে ফেলতে মন চায়নি। তারপর আলাপ হল তোমার সঙ্গে। ভাবলাম তোমাকে দিয়েই পরীক্ষা করব। তুমি জীবন দেবে জগতের কল্যাণের জন্য। কেউ জানবে না তবুও তুমি হবে অবিনশ্বর। মৃত্যুর পরেই তোমার আত্মাকে বন্দী করার চেষ্টা করব যন্ত্রের মধ্যে। তারপর সেই শক্তিকে কাজে লাগাব। পরমাণু শক্তিকেও হারিয়ে দেবে এর প্রচণ্ড শক্তি। আমি জানি একাজে সাফল্যলাভ ঘটলে জগতে আসবে আলোড়ন। তুমি হবে সেই আলোড়নের মূল।

২রা জানুয়ারী—কিন্তু প্রিয়তোষ, আমাকে না জানিয়ে তুমি কোথায় চলে গেলে। তাহলে আমার গবেষণা কি শেষ হতে পারবে না? শ্যামলও চলে গেল জার্মানীতে। একরকম আমাকে কিছু না জানিয়ে। যাক ও ভালোই হয়েছে। ওকে হয়ত মারতে পারতাম না। তাহলে এবার কি করব? আর কাকে পাব? এদিকে বুঝতে পারছি আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে।

তাহলে কি নিজের ওপরই পরীক্ষা চালাব আর সব কথা জানিয়ে যাব কাউকে? কিন্তু লোকে যদি বিশ্বাস না করে? না করুক তাহলেও আমাকে গবেষণা শেষ করতেই হবে। এই নতুন তথ্য আমাকে জগতকে জানাতেই হবে। বিশ্ব জানুক ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্য, আত্মা অজর অমর। আবার তাকে কাজে লাগানো চলতে পারে। এর মধ্যে নিহিত আছে প্রচণ্ড শক্তি।

৩রা জানুয়ারী—

এবার তাহলে প্রস্তুত হতে হবে। আর সময় নেই। কালকেই হবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়ে পান করব পটাসিয়াম সায়ানাইড। ধীরে ধীরে নিবে আসবে আমার জীবন

প্রদীপ। আর যন্ত্রটাও ধরে নেবে আমার অবিনশ্বর আত্মার শক্তিকে।

প্রিয়তোষ, তুমি আসবে আমার ল্যাবরেটরীতে। যন্ত্রটা চালাবার আর বন্ধ করার সব কথা লেখা আছে আমার ড্রয়ারের মধ্যে একটা মোটা খাতায়। পৃথিবীকে তুমি জানাবে আমার কথা। আর আমার কিছু বলার নেই। বিদায়!

ডায়েরী পড়া শেষ করে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

ডক্টর সান্যাল আত্মহত্যা করেছেন শেষ পর্যন্ত। ডায়েরীর পাতায় শেষ তারিখ রয়েছে ৩রা জানুয়ারী! আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী। একমাস হয়ে গেছে। একটা অজানিত আশঙ্কায় কেঁপে উঠলাম। ডক্টর সান্যাল আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কি ভয়ানক।

ডক্টর সান্যাল কি তবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন? এখনও কি তাহলে তার আত্মা বন্দী হয়ে আছে তাঁরই আবিষ্কার ঐ ভয়ানক যন্ত্রটার মধ্যে! বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এছাড়া আর কি হতে পারে?

বুঝতে পারলাম না তার ল্যাবরেটরীতে যাওয়া উচিত হবে কি না। একটা আশঙ্কা আর ভয় থির থির করে কাঁপছে মনের মধ্যে।

পরদিনই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কাগজ খুলতেই বোসে পড়ল। একটা সংবাদ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর নিরঞ্জন সান্যালের ল্যাবরেটরী এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। ডক্টর তাঁর ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। গত একমাস তার কোন খোঁজ খবর নেই। পুলিশ বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে।

পুলিশ অনুসন্ধান করুক। কিন্তু আমি জানি এ বিস্ফোরণের কারণ কি? ডক্টর সান্যালের বায়ুভূত আত্মার শক্তিই ঘটিয়েছে এই ভয়ানক বিস্ফোরণ। কিন্তু একথা বিশ্বাস করবে না কেউ। তবুও জানালাম সকলকে সব কথা।

ডক্টর সান্যালের ওপর আমার রাগ নেই।

হারিয়ে ফেলার মনোকষ্ট থেকে রেহাই পাবার চিরন্তন এ কী আকুলতা!

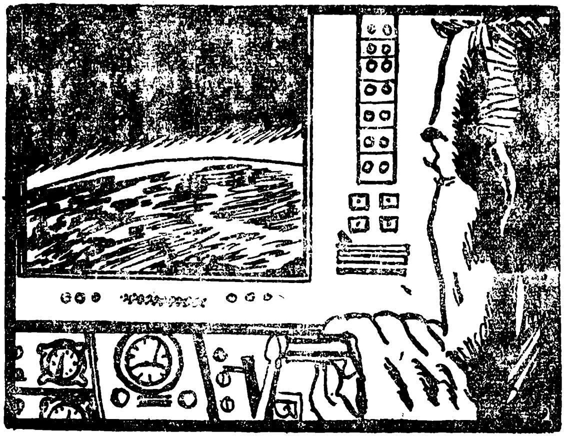

কেউ জানলো না, কি হারালো!

বিশু দাস

মহাকাশযানে একমাত্র যাত্রী। যন্ত্রের একঘেয়ে গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মৌচাকের মত অজস্র ছোট ছোট কুঠরী তারই একটাতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে সমরজিৎ মহলানবীশ। পৃথিবীর পানে উর্ধশ্বাসে ছু'ট চলেছে মহাকাশযান—মস্ত একটা রুপোলী ছুঁচ যেন মহাশূন্যের অন্ধকার অবগুণ্ঠনে সেলাই করে চলেছে অবিরাম। বাঁচবার আশা ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সে।

বিশ বছর মহাশূন্যের মাঝে কাটিয়ে ঘরে ফিরছে সমরজিৎ।

ঘর। পৃথিবী। বাংলাদেশের ছোট্ট এক শহর। মুক্ত বাতাস, গাছের সারি, ছায়া ঘেরা পথ। শহরের প্রান্তে ছোট দোতলা সাদা

বাড়ী। দুটি দশক নক্ষত্রের রাজ্যে কাটিয়ে ফিরে আসছে সমরজিৎ, মাটি মায়ের কোলে।

নরম মাখনের মত অন্ধকার কেটে এগিয়ে আসছে মহাকাশযান। পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার—জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। সীমাহীন অন্ধকার, যেন দেখেও দেখছে না সে।

সমরজিৎ ভাবছে—ভাবছে অতীতের কথা।

মায়ের চিন্তান্বিত মুখ, পুত্রের নিরাপত্তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ফিসফিস শব্দ। মহাকাশযানে চড়বার আগে অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখা—মায়ের বুকের সে উত্তাপ বিশ বছর পরেও তেমনি করেই মনে পড়ছে সমরজিতের। মনে পড়ছে বাবার কথা: লম্বা শীর্ণ চেহারা, মনে পড়ছে বিদায় দেবার আগে দুহাত ধরে সাফল্য কামনা করার দৃশ্য। বিশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সেদিনের কথা।

এতদিনে তাঁদের চুল সাদা হয়ে গেছে, চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে ভাবতেও অবিশ্বাস্য মনে হয় সমরজিতের। বার্ধক্যের জন্যে বাবাকে লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, মায়ের শরীর ঝুঁকে পড়েছে বয়সের ভারে, এসব কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না তার। আর সে নিজে?

তার বয়স এখন ৪১—মহাশূন্যের রুক্ষতা তার দেহেও এনেছে রুক্ষতার আভাষ। পৃথিবীর বাইরে বহু ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাকে, যে ঝড়ের কল্পনাও পৃথিবীর মানুষের মনে আসবে না। আমাদের সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় কাটাতে হয়েছে তাকে কর্মব্যস্ত দিন। চৌকো মুখে একটা কঠিন ভাব এসেছে, চোখ দুটো বসে গেছে কোটরে।

সমরজিৎ পকেট থেকে বার করলো বাবা মায়ের ছবিটা। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। বেশ হাসি-হাসি মুখ, পুত্রের

আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। সমরজিৎ মায়ের শেষ চিঠিখানির ভাঁজ খুললো আস্তে আস্তে। কতবার সে মাকে বলেছে কণ্ঠস্বর টেপরেকর্ড করে পাঠাতে, কিন্তু মা রাজী হননি একবারও। মনের কথা; তিনি নাকি হৃদয়হীন কঠিন ধাতব পাতের কাছে বলতে পারেন না। পুরোনো দিনের মত মোটা শরের কলম দিয়ে ধরে ধরে লিখেছেন তার মনের কথা, ছেলের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দিনই চিঠিটা পৌঁচেছিলো সমরজিতের কাছে, মা লিখেছেন ঃ

পরম কল্যাণীয়,

আমরা ভীষণ উৎকণ্ঠিত! তোমার বাবা আর আমি বার বার তোমার গলার স্বর শুনছি, যে তুমি পৃথিবীতে ফিরে আসছ। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসংখ্যবার—তোমার যাত্রা শুভ হোক—নিরাপদ হোক। তোমাকে দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি, বাবা। ইদানীং আমাদের দুজনারই শরীর ভালো যচ্ছে না। তোমার বাবার বুকের ব্যথা বেড়েছে, তিনি কাজকর্ম করতে পারেন না ভালো করে। তোমার ফিরে আসার সংবাদটা তাকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করে তুলেছে। আমার শরীরও ভালো নয়, গত সপ্তাহে কয়েকদিন ভুগেছি। তবে, ভয়ের কোন কারণ নেই—তুমি চিন্তা কোরো না। ডাঃ বলেছেন বিশ্রাম নিতে, আমি তার কথামত বিশ্রাম নিচ্ছি। আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে উঠবো। তুমি ফিরে আসতে আসতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবো। তুমি নিরাপদে ঘরে ফিরে এসো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সব বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করেন। তোমার কথা ভেবেই আমাদের দিন কাটছে। তুমি এলেই নতুন জীবন ফিরে পাবো আমরা। ভালবাসা নিও।

আশীর্বাদিকা—'মা'

চিঠিটা ভাঁজ করে একপাশে রেখে হাত দুটো মুঠো করলো সমরজিৎ। জীবনের আর ক' ঘণ্টা মেয়াদ তার, অথচ পৃথিবী এখনও কয়েকদিনের পথ। বাংলাদেশের সেই ছোট্ট শহরটি এখনও কতদূর;

সমরজিৎ জানে আর কোনদিনই সেখানে সে পৌঁছাতে পারবে না—হয়তো তার মৃতদেহটা গিয়ে পৌঁছাবে।

আগের মত আজ আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগলো রবার্ট ফ্রষ্ট-এর সেই বিখ্যাত কবিতার শেষ তুটি লাইন। মনে মনে আওড়াতে লাগলো সমরজিৎ :

...But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep....

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সে, পৃথিবীতে তাঁকে পৌঁছাতেই হবে—পৃথিবীতে সে ফিরবেই।

ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, "পৃথিবীতে পৌঁছানোর আশা একান্তই অবাস্তব। মহাশূন্যেই মৃত্যু হবে তোমার।"

তাঁরা সমরজিতের মৃত্যু-তালিকা পর্যন্ত তৈরী করে দিয়েছে, একেবারে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। কখন তার হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে তা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন তাঁরা। রোগটা ধরিয়েছে সমরজিৎ পৃথিবীর বাইরে, অন্য এক জগতে—তুরারোগ্য ব্যাধি। মৃত্যু অবধারিত সমরজিতের।

কিন্তু তবু সে বাড়ীর পথে রওনা হ'য়েছে, পৃথিবীর মাটির টান সে উপেক্ষা করতে পারেনি। ডাক্তাররা অবাক হয়ে শুনেছে তার প্রলাপ।

জীবনের আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। সমরজিৎ পায়চারী করে বেড়াচ্ছে মহাকাশযানের লম্বা বারান্দায়। ধাতব মেঝেতে খট্ খট্ শব্দ তুলছে তার পায়ের জুতো—মৃত্যুর নিস্তব্ধতাকে দূরে সরিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস।

শেষে, সমরজিৎ ওর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে তৈরী হলো। বন্ধ দরজার সামনে এসে থামলো সে, একটা ছোট্ট ডায়েল-এ মোচড় দিলো, দরজা খুলে গেলো। ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটির দিকে তাকালো সে। আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলো,

এটা ওটা নাড়াচাড়া করলো। লম্বা লোকটি সরব হলো এবার। "সময় হয়েছে ?"

"হ্যাঁ", জবাব দিলো সমরজিৎ, "সময় হয়েছে।"

লম্বা লোকটি নিঃশব্দ পদক্ষেপে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলো; তার কোটরাগত দুই চোখে দেখা গেলো আলোর ঝিলিক। লোকটার মুখ চারকোনা, চোখে মুখে রুক্ষ কাঠিন্য। "বুঝলে", হেসে বললো সে, "আমি ঠিক আছি।"

"তুমি ও", বললো সমরজিৎ। একটু ভাবলো সে, সব কিছু নির্ভর করে উৎকর্ষতার ওপর। সামান্য একটু ফাঁক থাকলেও চলবে না। একটুও না। "আমার নাম সমরজিৎ মহলানবীশ", বললো লম্বা লোকটি। তার গায়ে মহাকাশযাত্রীর পোষাক। "আমার বয়স ৪১ বছর, দেহ মনে সম্পূর্ণ সুস্থ আমি। গত দু দশক আমি মহাকাশে ছিলাম—এবার আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি।"

সমরজিৎ হাসলো, কেমন যেন বিষণ্ণ হাসি। ক্লান্ত মুখে দেখা দিলো একটু আলোর আভাষ।

"আর কতক্ষণ ?", জিজ্ঞেস করলো লম্বা লোকটা।

"দশ মিনিট। হয়তো কয়েক সেকেণ্ড বেশী", আস্তে আস্তে বললো সমরজিৎ। "ওরা বলেছিলেন যে অবস্থাটা হবে সম্পূর্ণ যন্ত্রহীন।"

"তারপর...", লম্বা লোকটি থেমে গেলো হঠাৎ, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

সমরজিৎ হাসলো আবার। সে জানতো যে একটা যন্ত্র, তা যত নিখুঁতই হোক না কেন, কখনও দুঃখের অনুভূতি তার পক্ষে কোন রকমেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—কিন্তু কথাগুলো শুনে অনেকটা সান্ত্বনা পেলো সে, মনে।

ও ঠিক উপযুক্তই হবে, ভাবলো সমরজিৎ। আমার মত অভিনয় করে যাবে ও, বাবা মা কেউ কোনদিন সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবেন না যে আমি ঘরে ফিরে যাইনি। মাত্র একটা মাস, পূর্বব্যবস্থামত

যান্ত্রিক মানুষটা পৃথিবীতে থাকবে বাবা মায় কাছে।

"মনে রাখবে", বললো সমরজিৎ, "তুমি যখন তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবে তখন তাঁরা যেন বিশ্বাস করেন যে সত্যি সত্যিই তুমি মহাকাশে ফিরে যাচ্ছো।"

"তা তো করবেই", বললো যান্ত্রিক মানুষটা। সমরজিৎ তার নিজের রেকর্ড করা গলা শুনতে লাগলো, "একমাস বাবা মার সঙ্গে কাটাবার পর তাঁরা আবার দেখবেন আমি মহাকাশযানে চড়ছি। তাঁরা দেখবে আগুনের হাল্‌কা বেরিয়ে আসছে মহাকাশযান থেকে, আাম আবার ছুটে চলেছি মহাশূন্যের গভীরতায়। আরও বিশ বছর কাটবে আমার, পৃথিবীর সীমানার বাইরে। তাঁরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন তাঁদের ছেলে আবার একদিন ফিরে আসবে। একজন মহাকাশযাত্রী ষাট বছর বয়স হবার আগে বিশ্রাম নেয় না কখনও। আমি তোমাকে বলছি সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চলবে।"

পরিকল্পনাটা নিশ্চয়ই বিফল হবে না, নিজের মনেই বললো সমরজিৎ; প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির ঠিক ঠিক মত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আমার স্মৃতিতে যা কিছু ছিলো সবই ওর মধ্যে রয়েছে; ওর কণ্ঠস্বর হুবহু আমার মত, প্রতিটি অভ্যেস আমার অভ্যেসের মত। যখন সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নক্ষত্রের রাজ্যে ফিরে আসবে, মহাশূন্য থেকে আমার গলা তাঁরা শুনতে পাবেন টেপ রেকর্ডার-এর দৌলতে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁরা পরম নিশ্চিন্তে থাকবেন, তাঁদের সন্তান এখনও মহাশূন্যের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেন না যে আমি চিরকালের মত হারিয়ে গেছি, এসব কথা বার বার মনে আসছে সমরজিতের। "তুমি প্রস্তুত?" প্রশ্ন করল লম্বা লোকটা।

"হ্যাঁ", মাথা নেড়ে জবাব দিলো সমরজিৎ, "আমি প্রস্তুত।" লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলো দুজনে।

সমরজিতের মনে পড়তে লাগলো সেদিনের কথা, যেদিন সে

এটা ওটা নাড়াচাড়া করলো। লম্বা লোকটি সরব হলো এবার। "সময় হয়েছে ?"

"হ্যাঁ", জবাব দিলো সমরজিৎ, "সময় হয়েছে।"

লম্বা লোকটি নিঃশব্দ পদক্ষেপে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলো; তার কোটরাগত দুই চোখে দেখা গেলো আলোর ঝিলিক। লোকটার মুখ চারকোনা, চোখে মুখে রুক্ষ কাঠিন্য। "বুঝলে", হেসে বললো সে, "আমি ঠিক আছি।"

"তুমি ও", বললো সমরজিৎ। একটু ভাবলো সে, সব কিছু নির্ভর করে উৎকর্ষতার ওপর। সামান্য একটু ফাঁক থাকলেও চলবে না। একটুও না। "আমার নাম সমরজিৎ মহলানবীশ", বললো লম্বা লোকটি। তার গায়ে মহাকাশযাত্রীর পোষাক। "আমার বয়স ৪১ বছর, দেহ মনে সম্পূর্ণ সুস্থ আমি। গত দু দশক আমি মহাকাশে ছিলাম—এবার আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি।"

সমরজিৎ হাসলো, কেমন যেন বিষণ্ণ হাসি। ক্লান্ত মুখে দেখা দিলো একটু আলোর আভাষ।

"আর কতক্ষণ ?", জিজ্ঞেস করলো লম্বা লোকটা।

"দশ মিনিট। হয়তো কয়েক সেকেণ্ড বেশী", আস্তে আস্তে বললো সমরজিৎ। "ওরা বলেছিলেন যে অবস্থাটা হবে সম্পূর্ণ যন্ত্রহীন।"

"তারপর...", লম্বা লোকটি থেমে গেলো হঠাৎ, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

সমরজিৎ হাসলো আবার। সে জানতো যে একটা যন্ত্র, তা যত নিখুঁতই হোক না কেন, কখনও দুঃখের অনুভূতি তার পক্ষে কোন রকমেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—কিন্তু কথাগুলো শুনে অনেকটা সান্ত্বনা পেলো সে, মনে।

ও ঠিক উপযুক্তই হবে, ভাবলো সমরজিৎ। আমার মত অভিনয় করে যাবে ও, বাবা মা কেউ কোনদিন সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারবেন না যে আমি ঘরে ফিরে যাইনি। মাত্র একটা মাস, পূর্বব্যবস্থামত

যান্ত্রিক মানুষটা পৃথিবীতে থাকবে বাবা মায় কাছে।

"মনে রাখবে", বললো সমরজিৎ, "তুমি যখন তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবে তখন তাঁরা যেন বিশ্বাস করেন যে সত্যি সত্যিই তুমি মহাকাশে ফিরে যাচ্ছো।"

"তা তো করবেই", বললো যান্ত্রিক মানুষটা। সমরজিৎ তার নিজের রেকর্ড করা গলা শুনতে লাগলো, "একমাস বাবা মার সঙ্গে কাটাবার পর তাঁরা আবার দেখবেন আমি মহাকাশযানে চড়ছি। তাঁরা দেখবে আগুনের হাল্কা বেরিয়ে আসছে মহাকাশযান থেকে, আম আবার ছুটে চলেছি মহাশূন্যের গভীরতায়। আরও বিশ বছর কাটবে আমার, পৃথিবীর সীমানার বাইরে। তাঁরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন তাঁদের ছেলে আবার একদিন ফিরে আসবে। একজন মহাকাশযাত্রী ষাট বছর বয়স হবার আগে বিশ্রাম নেয় না কখনও। আমি তোমাকে বলছি সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চলবে।"

পরিকল্পনাটা নিশ্চয়ই বিফল হবে না, নিজের মনেই বললো সমরজিৎ; প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির ঠিক ঠিক মত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আমার স্মৃতিতে যা কিছু ছিলো সবই ওর মধ্যে রয়েছে; ওর কণ্ঠস্বর হুবহু আমার মত, প্রতিটি অভ্যেস আমার অভ্যেসের মত। যখন সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নক্ষত্রের রাজ্যে ফিরে আসবে, মহাশূন্য থেকে আমার গলা তাঁরা শুনতে পাবেন টেপ রেকর্ডার-এর দৌলতে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁরা পরম নিশ্চিন্তে থাকবেন, তাঁদের সন্তান এখনও মহাশূন্যের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেন না যে আমি চিরকালের মত হারিয়ে গেছি, এসব কথা বার বার মনে আসছে সমরজিতের। "তুমি প্রস্তুত?" প্রশ্ন করল লম্বা লোকটা।

"হ্যাঁ", মাথা নেড়ে জবাব দিলো সমরজিৎ, "আমি প্রস্তুত।" লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলো দুজনে।

সমরজিতের মনে পড়তে লাগলো সেদিনের কথা, যেদিন সে

চাকুরীতে যোগ দেবার জন্যে মনোনীত হলো। কি আনন্দ হয়েছিল বাবা মার। তাদের শহরে সে-ই একমাত্র মনোনীত হয়েছিলো। সেই দিনটার কথা কোনদিন ভুলবে না সে! বাজনা বাজছিলো, শহরের পৌরপ্রধান নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, "সমরজিতের জন্যে সমস্ত শহরবাসী আজ গর্বিত"... আনন্দে মায়ের দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রু।

তারপরই তাকে চলে যেতে হয়েছিলো মহাকাশে। যারা মনোনীত হয়নি তারা হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলো সমরজিতকে। জীবনে প্রথম যেদিন চন্দ্রগামী মহাকাশযানকে উড়তে দেখেছিলো সমরজিৎ, সেই দিনই তার মনে হয়েছিলো যে মহাকাশযাত্রী হবে সে। সেটা বোধহয় ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। সমরজিৎ তখন বারো বছরের ছেলে। আগুনের নিশ্বাস ফেলে ছুটে যেতে দেখছিলো সে মহাকাশযানকে। সেইদিনই মনে মনে ভেবেছিলো সে যে একদিন ঐ রকম যানে চড়ে সেও পাড়ি জমাবে মহাশূন্যে। সেইদিন থেকেই সমরজিৎ স্বপ্ন দেখেছে পৃথিবী ছেড়ে অ-নে-ক দূরে চলে যাবার—স্বপ্ন দেখেছে কল্পনার জগতে গিয়ে হাজির হবার।

অন্যদের মধ্যে অনেকেই চায়নি মহাশূন্যে পাড়ি দেবার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে। এমনকি, আজ বিশ বছর পরেও তার মনে পড়ছে জয়ন্তীর কথাগুলো; "আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, সমর; কিন্তু সবার চেয়ে বেশী ভালবাস না। আমার জন্যে তোমার জীবনের স্বপ্ন তুমি ত্যাগ করতে রাজী নও।" জয়ন্তী সমরজিৎকে ত্যাগ করেছে, তারপর সমরজিতের জীবন থেকে চির বিদায় নিয়েছে জয়ন্তী, কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো যে সমরজিতের হৃদয়ে তার স্থান নেই; সেখানে আছে শুধু শূন্যতা, মহাশূন্যের হাতছানি, রকেট, আর জ্বলন্ত নক্ষত্র। আর কিছু না। সমরজিতের আজ মনে পড়ছে, বিশ বছর আগে পৃথিবীতে শেষ রাত্রিটির কথা। সারারাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছে মহাশূন্যের অসীমতার কথা। ভোর

হওয়া পর্যন্ত দু চোখের পাতা এক করেনি। দেহ মনে একটা উত্তেজনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো তার। সকাল হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে ছিলো বিছানায়। ভোরের সময় সামান্য একটু বৃষ্টি হয়েছিলো, সে কথাও মনে পড়ছে আজ। ছাতের ওপর বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ, আকাশের গায়ে বিজলীর চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক, কানফাটানো শব্দ, সে স্মৃতি এতটুকু মলিন হয়নি এই বিশ বছরেও। তারপর, একসময় বজ্রপাতের শব্দ মিশে একাকার হয়ে গেছে মহাকাশযানের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে, সমরজিৎ পৃথিবী ছেড়ে ছুটেছে মহাকাশে...ছুটেছে নক্ষত্রের দেশে···দূরে···অ-নে-ক দূরে···।

মহাকাশযাত্রীর পোষাক পরা লম্বা লোকটা এয়ারলক্‌টা বন্ধ করে দিয়ে স্বচ্ছ জানলার ভেতর দিয়ে চেয়ে রইলো সমরজিতের দেহটার দিকে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। কলকব্জাগুলো যথানিয়মে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে অবিশ্রান্ত। সমরজিতের পথযাত্রা শেষ হলো, দীর্ঘ পথের হলো সমাপ্তি। মহাশূন্যের বুকে চির নিদ্রিত হয়ে রইলো সে।

জুলাই মাসের এক উজ্জ্বল প্রত্যূষে মহাকাশযান এসে নামলো পৃথিবীর মাটিতে। চতুর্দিকে অপেক্ষমান জনতা চীৎকার করতে আরম্ভ করলো সমরজিতের নাম ধরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাতের রঙীন পতাকা দুলিয়ে স্বাগত জানাতে লাগলো তাদের দেশের বীর সন্তানকে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সবাই উপস্থিত, একজনও আজ ঘরে নেই। যাঁরা বক্তৃতা দেবেন তাঁরা মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছেন তাঁদের বক্তব্য। শহরের সবচেয়ে নামকরা বাজনাওয়ালারা বাজিয়ে চলেছে তাদের প্রিয় সুর···হঠাৎ সবাই থেমে গেলো—নিস্তব্ধতার মাঝে শোনা যেতে লাগলো মহাকাশযানের এয়ারলক্‌ খোলার শব্দ।

সমরজিৎ বেরিয়ে এলো বাইরে। দীর্ঘ, বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা, গায়ে চমৎকার পোষাক, সূর্যের আলোর নানা রং ঠিকরে পড়ছে পোষাক থেকে। একটু হেসে হাত তুলে অভিবাদন করলো সবাইকে। জনতা

আবার চীৎকার করে উঠলো একসঙ্গে—সমরজিতের দুঃসাহসিক অভিযানের স্বীকৃতি।

জনতার শেষপ্রান্তে অপেক্ষা করছে দুটি মূর্তি ; একজন বৃদ্ধ, বসসের ভারে নুয়ে পড়েছে দেহ, হাতে ধরা লাঠিটা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। আর একজন, শুভ্রবেশী মহিলা—সমরজিতের মা। বৃদ্ধার স্তিমিত চোখের দৃষ্টি যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লম্বা লোকটি শুভাকাঙ্ক্ষী জনতার ভীড় ঠেলে তাঁদের কাছে এগিয়ে যেতেই তারা উন্মাদের মত বুকে চেপে ধরলেন ওকে। তাঁদের হাত ধরে লম্বা লোকটা এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। অশ্রুসিক্ত চোখে তাঁরা বার বার ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁদের প্রিয় সন্তান সমরজিৎ, আবার ফিরে এসেছে তাঁদের বুকের মাঝে।

"হ্যাঁ", ভীড়ের শেষ প্রান্তে একজন বললো, "ওরা চলে গেলো।"

তার সঙ্গী মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "এখনও আমি জিনিষটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এটা উচিৎ হয়নি।"

"কিন্তু ওরা তো তা-ই চেয়েছিলেন", বললো প্রথম জন। "ওদের উইলেও লেখা আছে যে সমস্ত সম্পত্তি পাবে ওদের ছেলে সমরজিৎ, যেদিনই সে ফিরে আসুক না কেন। একমাস পরেই আবার সে ফিরে চলে যাবে। আবার বিশ বছর পৃথিবীর বাইরে। যে কটা দিন আছে পৃথিবীতে, বেচারা বাবা মার কাছেই কাটাক। ওকে বিরক্ত করা উচিৎ নয় এখন।" লোকটা থামলো, দূরে দুটি মূর্তির দিকে দেখিয়ে বললো, "বেশ আনন্দেই আছে ওরা। বেচারা কোনদিন জানতেও পারবে না।"

"আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছো", জবাব দিলো দ্বিতীয় জন, "ও কোনদিনই জানতে পারবে না।" তারপর দুজনে তাকিয়ে রইলো অপসৃয়মান তিনটি মূর্তির দিকে, যতক্ষণ না তারা চলে গেলো দৃষ্টি-সীমার বাইরে।*

*William F. Nolan রচিত "And miles to go......" গল্পের ভাবানুবাদ।

একটি নতুন অ্যাডভেন্‌চার·· ······

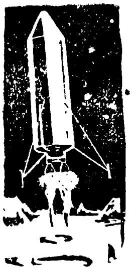

নাড়ুদার বিচিত্র কাহিনী

সুরজিৎ চৌধুরী

···হ্যালো —রজার —টু নট্‌ থ্রী—রিপোর্ট মাই সিগ্‌ন্যাল—ওভার।...হ্যালো—রজার—টু নট্‌ থ্রী.........

—"নো হোপ্‌ এট্‌ অল্‌; কোনও আশা নেই। রজার ২০৩'র সাথে আমাদের আর যোগাযোগের কোনও আশা নেই।' হেড্‌ফোনটা খুলতে খুলতে সমীর বললে।

—"কিন্তু কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ তো হবার কথা নয়! তবে কি এমন ঘটলো? সত্যি, মহাকাশের অনেক রহস্যের সমাধান এখনও আমরা জানি না। নিউটনের সাগরবেলায় নুড়ি কুড়োনোর মতো আমরাও নুড়িই কুড়োচ্ছি। সে কাজটা আরো কয়েক হাজার নিউটনের আসা যাওয়ার পরও শেষ হবে না!"

রজতের দার্শনিক মতবাদ শুনে সমীর বললো, —"তা' না হয় হলো। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের দেশটাকে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ঢেকে রাখা হয়নি, সেটা কি মনে হচ্ছে না? কাল যখন এ'খবর বেরোবে তখন হুলুস্থুল পড়ে যাবে না সারাদেশে! সেটার কী করা যাবে? আপাততঃ ঐ কথাই ভাব।"

—"সত্যি, এ'সময় মিষ্টার ভট্টাচার্যকে আমাদের যেতে দেওয়াটাই উচিত হয়নি। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার ছিল।" একটু চিন্তা করে রজত দাসগুপ্ত বললো, "যা' হবার তা' তো হ'ল এখন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি সেটাই ভেবে দেখা যাক্। রাতও অনেক হয়েছে।"

—হ্যাঁ, তাই চল। তুমি মিস দত্তকে বল রিসিভারটা নিয়ে বসতে। আর র‍্যাডার, রেডিও টেলিস্কোপ এবং টি. ভি.—সব যন্ত্রপাতি যেন চালু রেখে নজর রাখে।".... ....

....বাইরে ইল্‌সে-গুঁড়ি বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টি চলছিল কিছুদিন। আজ একটু কমের দিকে। সবাই মিলে চিনে বাদাম খাচ্ছি। খোসাটা ছাড়িয়ে দুটো বাদাম পরিষ্কার করে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে আমাদের আজকের সভার প্রধান এবং একমাত্র বক্তা নাড়ুদা বললেন,

—"রজার ২০৩'র একমাত্র মহাকাশযাত্রী ছিলাম আমি।" (হ্যাঁ, নাড়ুদা, বিখ্যাত নারায়ণ ভট্টাচার্য! যিনি বহুবার মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন! যিনি মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক ঘটনারই প্রথম পার্থিব মানুষ! যিনি শিং ভেঙ্গে বাছুরের, মানে আমাদের আড্ডায় এসে আমার ঘরটিকে ধন্য করেন এবং চা ও তৎসহ টা খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করেন প্রায়শঃই। তেমনই আজও এসেছেন।)

একটি বাদামের সৎকার করে আরেকটির দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন,

—"কিন্তু এই প্রথমবার মহাকাশ ভ্রমণে এসে বিব্রত বোধ করলাম। বৃহস্পতি গ্রহ তদন্ত কমিটির প্রধান সদস্য হিসাবে আমাকে পাঠানো হ'ল। পাঠানো হ'ল বললে অবশ্য ভুল করা হবে। আমি স্বেচ্ছায়ই গেলাম। গত বৎসর মার্চ মাসে থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে অন্যান্যদের মতো মিঃ ষ্টিফেনশন বৃহস্পতি গ্রহের উদ্দেশে গিয়েছিল। সেখানে তামাজাতীয় একটি ধাতব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যা' থেকে সহজ আণবিক বিভাজনে কৃত্রিম সোনা পাওয়া যায়।—কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই ষ্টিফেন ফিরে এসে জানায় বৃহস্পতি গ্রহ মানবের অগম্য। ঐ গ্রহটির চারদিকে নাকি একটা এ্যান্টি-গ্রাভিটি বলয় তার মহাকাশ যানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। বার বার চেষ্টা করেও বিফলকাম

হওয়ায় সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এরপর বহু যাত্রীবিহীন রকেট ওই গ্রহটির দিকে পাঠানো হয়। কিন্তু সবগুলোই একে একে ফিরে আসে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এর পরেই ডাক পড়ল আমার।”

আমরা একটু নড়েচড়ে বসলাম। রতন বললো,

—“জম্‌বে মনে হচ্ছে।” নাড়ুদা বেশ মনোযোগ সহকারে একটা বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। কথাটা তার কানে ভাল ঢোকেনি বোধ হয়। তাই জিজ্ঞেস করলেন,

—“কি বললি ?”

—“না, বৃষ্টিটা এবারে থামবে মনে হচ্ছে, তাই বললাম। বলুন আপনি তারপর কী হ’ল।” নাড়ুদা বলেন,

—“বৃহস্পতি গ্রহ তখন পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখতে হয়েছে। এমন সময় সভয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার বেতার যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ করছে না। এ অবস্থার জন্যে একদম প্রস্তুত ছিলাম না। আরও বুঝতে পারলাম আমার রকেটের গতিও ধীরে ধীরে কমে আসছে। একটা বিপরীতমুখী বেগ রকেটের সম্মুখগতি ব্যাহত করছে। তাড়াতাড়ি আমার রকেটের গতিমুখ পরিবর্তন করে দিলাম। আর একটু দেরী হলেই রকেটটা বঁড়শির ফাৎনার মতোই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতো।”

রকেটের অবস্থাটা কেমন হতো সেটা চিন্তা করে আমি হেসে উঠলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ুদার বাক্যবাণ ;—

—“খুব হাসি আসছে তাই না ? পড়তিস যদি আমার মতো অবস্থায়, তখন সেখানেই হার্টফেল হয়ে যেতো।—

এরপর আমি রকেটের কৃত্রিম গতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলাম। পূর্বের গতিতে ওটা চলতে লাগলো। এতসব কাজের পর একটু নিশ্চিন্তমনে ভাবতে বসলাম আমার পরবর্তী কর্মপন্থা। আপাততঃ কোন ভয় নেই। আজীবন বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরতে থাকব।”

—"নিউটন্‌স্‌ ফার্ষ্ট ল অব্‌ মোশন।" আমি এক ফাঁকে আমার বিদ্যা জাহির করলাম। নাড়ুদা একবার আমার দিকে ফিরে শুধু তাকালেন।

—"তাই যতদিন খাদ্য আছে ততদিন নিশ্চিন্ত। এরপর প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম বেগ সৃষ্টি করে যেখানে হোক যাওয়া যাবে। জ্বালানী তো রইলই।

কিন্তু কথা হ'ল, কি সেই বেগ (force) যা আমার অগ্রগতিকে বাধা দিলো? এটা যে একটা বিপরীতমুখী বেগ সেটা তো বোঝা যাচ্ছে। এই বেগটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্টো।"

—"অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহের গাছ থেকে আপেল পড়লে তা' মাটিতে না এসে আকাশে উড়ে যাবে।" আমার মন্তব্য শুনে নাড়ুদা বললেন,

—হ্যাঁ, জলের নীচে একটা রবারের বলকে ডুবিয়ে ছেড়ে দিলে বলটা যেমন ওপরে উঠে আসে ঠিক তেমন আর কি! কিন্তু কেন এই উর্ধচাপ?

যাই হোক, ও বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন আমার প্রথম কর্তব্য হ'ল বেতারযন্ত্রটি মেরামত করা। বহু চেষ্টাচরিত্র করেও কোনও দোষক্রটি দেখতে পেলাম না। আর সন্দেহ নেই সব গণ্ডগোলের মূলে ঐ বেগ, বা ফোর্স।

—'By force কোনও কাজ হয় না; Tactfully করতে হয়।' পিনু জানায়।

—"হ্যাঁ, সে বুদ্ধিটুকু ছিল বলেই একটার পর একটা বিপদ কাটিয়ে আজ তোদের এখানে এসে মৌজ করে আমার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে পারছি।"

—"কিন্তু ঐ ফোর্স; ওটা কিসের?" পিনুকে বাঁচাবার জন্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"সেটাই পরীক্ষা করতে বসলাম এরপর। একটা লোহার রড্‌ ইন্‌স্যুলেশন্‌ করা তার দিয়ে জড়িয়ে তারের দুটো মাথা বিদ্যুতের

প্লাগে গুঁজে দিয়ে রড্‌টাকে ফেলে দিলাম বাইরে। তারপর সুইচ্‌টা অন্‌ করে বিদ্যুৎ চালু করে দিলাম। আর সেই সঙ্গে বৃহস্পতিগ্রহের উল্টো দিকে একটা রেট্রো রকেট্‌ ছুঁড়ে দিলাম।"

—"তারে জড়ানো লোহার উপর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে ঐ লোহাটিতে চুম্বক হবে। কিন্তু তা'তে কি এমন ইন্টিবিলিষ্টিং হবে?" আমি না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না। উত্তরে নাড়ুদা, কটাক্ষপাত করে জানালেন,

—"যদি ঐ বিপরীতমুখী বেগটা চুম্বক বলয় হতো তবে বিদ্যুত-চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছু একটা হতো। সেইসঙ্গে রেট্রো রকেটের ধাক্কায় আমি বৃহস্পতিগ্রহে নামতে পারতাম।

কিন্তু না, কিছুই বোঝা গেল না। সুইচ্‌ বন্ধ করে লোহার রড্‌টা তুল্‌তে তুল্‌তে মাথায় আর একটা বুদ্ধি এলো। একটা তারের একমাথা রকেটের গায়ে আট্‌কে দিলাম আর একটা মাথা বিদ্যুৎ-প্লাগের পজিটিভ্‌ ছিদ্রটিতে ঢুকিয়ে আবার সুইচ্‌ টিপে দিলাম। আর এর ফলেই ঘটলো বিপর্যয়।"

—"কেন, কেন?" সকলের সমবেত প্রশ্ন।

—"আর কেন; পিতৃদত্ত প্রাণটা যেতে বসেছিল আর কি! একমাত্র আমার হাতে আয়ুরেখার পাশে মার্শাল রেখাটা ছিল বলেই সে যাত্রায় বেঁচে এসেছি!" নাড়ুদা গৌতমের দিকে তাকালেন। শুনেই আমাদের এ্যামেচার জ্যোতিষী গৌতম বলে উঠল,

—"দেখি, দেখি আপনার হাতটা একবার!"

—"বোস্‌ চুপ করে। এখন জ্বালাসনে আর।" নাড়ুদা ওকে থামিয়ে দেন।

—"সুইচ্‌ টেপার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বজ্রপাত। আমি রকেটের ভেতর উল্টে পড়লাম। ছাতে মাথাটা ঠুকে গেল। আবার রিবাউণ্ড হয়ে স্বস্থানে ফিরে এলাম। হঠাৎ রকেটের গতি বেড়ে গেল। ছুটে চলল মহাশূন্যে।"

আমি নাডুদার এই প্রাঞ্জল বিবরণে না হেসে পারলাম না। দুয়ে দুয়ে চার হয় কি দুধ হয় তা' চিন্তা করবার মতো বুদ্ধিও বোধহয় আমার নেই। কিসে কি হ'ল কিছুই মাথায় ঢুকছে না। অথচ অন্যান্য সকলে চুপচাপ বসে আছে। সেটা নাডুদার ধম্‌কির ভয়ে, না ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে তাই, তা' বুঝতে পারলাম না। আমি লজ্জা ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম,

—"এরকম অবস্থা কি করে হ'ল নাডুদা?" বলেই নাডুদার মুখের ব্যারোমিটারের দিকে নজর রাখলাম। নাঃ, ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। নাডুদা ঠাণ্ডা মেজাজেই বললেন,

—"বৃহস্পতি গ্রহের চারদিকে একটা স্থির-বিদ্যুতের বলয় ছিল! ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ রকেটটির গায়ে পজেটিভ্ বিদ্যুৎ পেয়ে সব ইলেকট্রন ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুটোয় মিলে বিরাট স্পার্ক বা বজ্রপাত। তার সেই ধাক্কায় রকেটের গতি গেল বদলে। ছুটে চলল মহাশূন্যে।"

বলেই আমাদের দিকে চাইলেন একবার। অর্থাৎ প্রতিবাদের মতলব আছে কি না সেটাই যাচাই করা। আমাদের তরফ থেকে কোনও প্রতিবাদ নেই দেখে নাডুদা বলে যান,

—"সারাটা আকাশ লালে লাল হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।" একথা শুনেই প্রতিবাদের সত্যিই ঝড় উঠল। রতন বলল,

—"লাল হবে কি করে? বিদ্যুৎ চম্‌কালে তো সাদা রং দেখাবে!" নাডুদা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন তাই সঙ্গে সঙ্গেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন,

—"সেটা আর আমাকে শেখাতে হবে না। বিদ্যুৎ চম্‌কাবার ফলে আকাশের নিওন গ্যাস জ্বলে উঠে আকাশ লাল হয়ে গিয়েছিল।"

"—ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবে না।" আমি মনে মনেই বললাম, মুখে বললাম, "তার পর কি হ'ল?"

—"আপন বেগে ছুটে চলেছে রজার-২০৩ অন্ধকারের বুক চিরে

অজানার উদ্দেশ্যে। জানি না এর শেষ কোথায়! এই গতিবেগকে আয়ত্তে আনবার সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু শক্তি নেই। সারাটা শরীর অবশ হয়ে আছে। ওঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। বিরাট একটা শক্ খেয়েছি।"

—"ইস্, ঐ অবস্থায় এক গ্লাস গরম দুধ খেতে পারলে খুব ভালো হতো।" রতন সহানুভূতি জানায়।

নাড়ুদা একবার ওর দিকে তাকালেন কটমট্ করে, এরপর বলতে লাগলেন,

—"নিস্তব্ধ মহাশূন্যে একটি তৃণের মতো ভেসে চলেছে রঞ্জার-২০৩। অনেক—অনেক সময় কেটে যায়।

আস্তে আস্তে অন্ধকারটা যেন ফিকে হয়ে আসে। চোখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। কাঁচের জানালাটা দিয়ে একটা গ্রহ দেখতে পেলাম, বেশ বড়সড়ই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ ফর্সা হয়ে উঠল রকেটের অভ্যন্তরভাগ। সবই দেখা যাচ্ছে। মনে দ্বিধা নেই কিছুক্ষণের ভেতর ঐ গ্রহটিতে গিয়ে পড়ব। শরীরের সব শক্তি একত্র করে উঠতে ওঠবার চেষ্টা করলাম আর একবার। কিন্তু পারলাম না। শরীরটা যেন আঠার মতো লেগে আছে রকেটের গায়ে। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলছে রকেটটি। তবে ভরসা, এত গতিতে ছুটে গিয়ে গ্রহটির বুকে আছড়ে পড়লেও রকেটের কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ রকেটের গায়ে সে বিষয়ে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল। এসব কথা ভাবতে না ভাবতেই উল্কাবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লাম গ্রহটির বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফিয়ে উঠলাম। আবার রকেটের ছাতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। আমার শরীরে তো আর তেমন কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল না। সেফ্টি বেল্টটা খুলে রেখেছিলাম। প্রথম ধাক্কায় কোনও রকমে সামলে উঠেছিলাম, কিন্তু এবারে আর পারলাম না। মাথাতে বেশ চোট্ লেগেছে। অচেতন হয়ে গেলাম।"

—"ওটা কোন্ গ্রহ জানতে পারলেন ?" নাড়ুদার চৈতন্য আনতে আমি প্রয়াসী হই। আমার কথার জবাব না দিয়ে নাড়ুদা বললেন,

—"কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। জ্ঞান হতে অনুভব করলাম মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মাথার কাছে চাপ চাপ রক্ত। অনেকক্ষণ পেটেও কিছু পড়েনি। তাই দুর্বল লাগছে। এবারে একটু চেষ্টা করতেই উঠে বসতে পারলাম। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কিছু খেয়ে নিলাম। জলে ডোবা মানুষ তীরের নাগাল পেয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালাম কিছুক্ষণ।

ঘুমের পর বেশ হাল্কা লাগল নিজেকে। উঠে গিয়ে কাঁচের জানালাটা দিয়ে বাইরে নজর দিলাম। পরিষ্কার আলো চারিদিকে। তবে ওটা সূর্যের আলো নয়। চাঁদের আলোর মতোই যেন মনে হ'ল। রুক্ষ মরুভূমি। যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ বালি। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

হল্‌দে রঙের পোষাকের ওপর মহাকাশযাত্রী পোষাকটা চাপিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতিসহ রকেট থেকে বেড়িয়ে এলাম।"

—"হল্‌দে রঙের জামা কাপড় আবার কী জন্যে ? সন্ন্যাসী হবার মতলব নাকি।" বলা বাহুল্য এটা রতনের জিজ্ঞাসা।

—"সে মতলব বহুদিন আগে ছিল! হল্‌দে পোষাকের ভেতর দিয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি শরীরে কম প্রবেশ করে। সে যাই হোক্; বাইরে বেরিয়ে একটু আশ্চর্য হ'লাম। চারদিকে এতো আলো অথচ আকাশে চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। চাঁদের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে তার আলো হলে অনেক ম্লান হতো। ঐ চাঁদটির আলো এটা নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এ নিশ্চয়ই মেরুজ্যোতি জাতীয় কোন আলো।

চারিদিকে যতদূর যাওয়া যায় সাবধানে ঘুরে এলাম। বালি—বালি আর বালি! এই রুক্ষ মরুভূমিতে কাটাবো কি করে তাই ভাবছি! দু'য়েকটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তু জানোয়ার দেখতে পেলেও রহাস্য রোমাঞ্চে দিন, sorry, দিন বললে ভুল হবে; রাত। কারণ

আসবার পর থেকে এত সময় কেটে গেল। রাতই দেখছি। দিনের মুখ দেখতে পেলাম না। এই রাত ভালই কাটতো।

সময় কাটাবার জন্যে প্রকৃতির বিশ্লেষণে বসলাম। বালিতে প্রচুর পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য এবং নতুন কয়েকটি ধাতু-লবণের সন্ধান পেলাম। কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে রাখলাম ভবিষ্যতের জন্যে। অবশ্য কেমন সেই ভবিষ্যৎ জানি না! এরপর বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় মনোযোগী হলাম, কয়েকটা কাঁচের বেল্‌জারের মুখ খুলে কিছুপর কাঁচের ঢাকনা দিয়ে জারের মুখ বন্ধ করে রকেটের ল্যাবোরেটারীতে গিয়ে বসলাম। একটা জারের ঢাকনা খুলে নিভন্ত দেশলাই কাঠি ঢুকিয়ে দিতেই কাঠিটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠ্‌ল! চম্‌কে উঠলাম।"

—"অক্সিজেন!!" নারুদাকে চম্‌কাতে শুনে আমি বলে উঠলাম, "তা হলে তো আর চিন্তার কিছু নেই! প্রাকৃতিক অক্সিজেনই পেয়ে গেলেন!"

—"নাঃ, হতাশ হতে হল!"

—"তবে কি অন্য কোন গ্যাস? কিন্তু একমাত্র অক্সিজেনই তো জ্বলতে সাহায্য করে অথচ নিজে জ্বলে না!!" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি।

—হ্যাঁ, অক্সিজেনই ছিল এবং তা' জ্বলতে সাহায্যও করেছিল। ওর ভেতরে গিয়ে শ্বাস নিলে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে আর কাঠখড় খুঁজতে হতো না। ঐ অক্সিজেন আমার ফুস্‌ফুসে ঢুকে বিনা খরচায় পারলৌকিক কাজটি সুসম্পন্ন করতো।

—"এ আবার কেমন কথা!" বিনয় বিস্ময় করে।

—"কথাটা ঠিকই। অক্সিজেন ছিল ঠিকই। কিন্তু ছিল না নাইট্রোজেন। সুতরাং ফুস্‌ফুসে ঢোকা মাত্র—ঐ যা বললাম।

সেই সঙ্গে পেলাম কিছু বিরল-গ্যাসের সন্ধান। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ঐ আলোর রহস্য! তাড়াতাড়ি গাইগার কাউণ্টার দিয়ে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করেই আমার সিল্‌টিমোর অবস্থা, মানে আক্কেল গুড়ুম। এ আমি কোথায় এসেছি!"

—"আমি আপনার গায়ে তো গেরুয়া-না-কি জানি পোষাক পরা ছিল।"

—"এ যা'তা জিনিষ নয়? মেনকা রম্ভার চাইতেও শক্তিশালী। গেরুয়া বসন পাত্তা পাবে না! আমি যে এতক্ষণ বেঁচে আছি সেটাই আশ্চর্য? ভগবানের অসাম করুণা আমার প্রতি।" নাড়ুদা হাত জোড় করে সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

—"হবে না কেন? মার্শাল রেখা আছে যে হাতে!" গৌতম জ্যোতিষী বিদ্যা আওড়ায়।

—"যা ভেবেছিলাম তাই। ঐ চাঁদের মতো যেটা দেখেছিলাম সেটা অনেক বড় হয়েছে। সুতরাং আর কোন ভুল নেই আমার ধারণার!"

—"ওটা কোন্ উপগ্রহ তা তো বলছেন না?" আমি জিজ্ঞেস করি।

—"বলব, সবই বলব। চাঁদের মতো ওটা উপগ্রহ নয়। ওটা একটা গ্রহ। আর আমি যেখানটায় আছি সেটাও কোন গ্রহ নয়, নক্ষত্রও নয়। ওটা একটা ধূমকেতু!

—"ধূমকেতু ???" শুনে আমাদেরও সিলটিমোর অবস্থা। নাড়ুদা আমাদের বাধা সত্ত্বেও না থেমেই বলে যান,—"সুতরাং আর থাকা উচিৎ নয়। যে করেই হোক এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। হঠাৎ মনে হ'ল রেডিও ট্রান্সমিটারটা একবার চালিয়ে দেখা যাক্। এখন তো আর ইলেকট্রন কণিকারা বাধা দেবে না। সত্যই তাই। সবই ঠিক আছে। যোগাযোগ করতে বেশী বেগ পেতে হল না। সারা পৃথিবীর মানমন্দিরগুলোতে হৈ চৈ পড়ে গেল, যে ধূম কেতুকে নিয়ে এতবড় সমস্যা সেই ধূমকেতু থেকেই কিনা একটা মানুষ কথা বলছে! তাও আবার পৃথিবীরই মানুষ!! সবাই অবাক।

[এরপর ১৬১ পৃষ্ঠায়]

জীবন-চেতনা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্ব-গভীর
রহস্য বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এক আশ্চর্য উপকথা !

সব পেয়েছির দেশে

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য

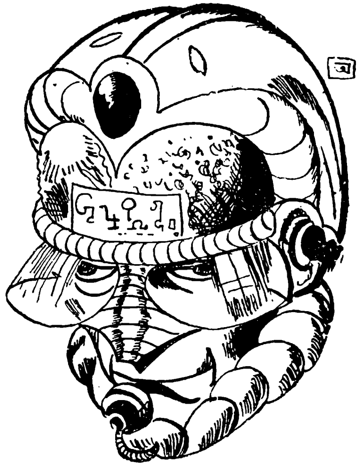

অবশেষে সেই রহস্যময় সবুজ গ্রহটায় ছোট্ট সোনালী সসারটা ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়াল। তখন সে জগতে ওদের সূর্য উঠেছে। মিষ্টি আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল।

যান্ত্রিক পরীক্ষায়, এখানকার আবহাওয়া হুবহু পৃথিবীর মতই জানতে পেরে, নিশ্চিন্তমনে সসারের দরজা খুলে সমরেশ ও সাগরিকা বেরিয়ে এল।

হঠাৎ চতুর্দিক থেকে কয়েকজন বন্দুকধারী মানুষ ছুটে এসে, প্রায় একশো হাত দূরে একটা বৃত্ত রচনা করে ঘিরে দাঁড়াল ওদের। দূরে একটা বিমান-বিধ্বংসী কামান নিয়ে কয়েকজন লোক খুব ধস্তাধস্তি করছে দেখা গেল।

আশ্চর্য! এই গ্রহের মানুষগুলি ঠিক পৃথিবীর মানুষের মতই। তবুও ওদের হাবভাব দেখে সাগরিকা সবিস্ময়ে বললে—কি মুস্কিল! ওরা কি আমাদের শত্রু ভেবেছে! আক্রমণ করবে না কি ?

সমরেশ কৌতুক করে বললে—না। গার্ড অফ্ অনার দিচ্ছে!

—এখন কি করবে ? উঁ ? ফিরে যাবে ?

—ঐসব মান্ধাতার আমলের অস্ত্রপাতি দেখে, ভয়ে পালাবো নাকি ? ফুঃ !

সাগরিকা ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল। না। কারও হাতেই কোন আধুনিক অস্ত্র নেই। অস্ত্রবিদ্যায় ওরা এখনও পৃথিবীর মানুষের তুলনায় শিশু! তবুও অকারণে ওদের রক্তপাত ঘটিয়ে, শত্রুতা সৃষ্টি করতে প্রবৃত্তি হল না কারও।

বিশৃঙ্খলভাবে লোকগুলি বন্দুক বাগিয়ে আবার এগিয়ে আসছে দেখে, সাগরিকা একটু রগড় করার লোভ সামলাতে পারল না। রশ্মিপিস্তলটা রেখে দিয়ে, সে কোমরবন্ধ থেকে অহিংস-রিভলবারটা বের করল। চারটে বরুণ বুলেট ভরল তাতে। তারপর রিভলবারটা তুলে চারদিকের আকাশে চারটা গুলী ছুঁড়ল। সেই বুলেটগুলো তু'দড়মার মত শূন্যে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল ; আর মুহূর্তে আকাশ অন্ধকার করে শুরু হয়ে গেল প্রবল বৃষ্টি! লোকগুলি নিমেষে ভিজে নেয়ে একসা।

নিজেদের পরনে প্লাষ্টিকের স্পেশস্যুট থাকাতে সমরেশ ও সাগরিকার কোন অসুবিধা হল না। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে, হাসতে হাসতে লোকগুলির তুর্দশা দেখতে লাগল।

খানিক পরে সাগরিকা পবন বুলেট ভরে, আবার চারটে গুলী ছুঁড়ল। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল সারাটা আকাশ। ঠাণ্ডার আমেজ নিয়ে, মৃতুমন্দ বাতাস বইতে লাগল। সূর্যালোকে ঝলমল করতে লাগল, সবুজ ঘাসের গালিচা মোড়া মস্ত মাঠটা।

এবার আর সেই বন্দুকধারী লোকগুলি এগিয়ে এল না। আরও খানিকটা পিছনে হটে গেল ওদের বৃত্তটা। একজন বৃদ্ধকে তারা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। নির্ভীক বৃদ্ধ সোজা এগিয়ে এসে, সমরেশ ও সাগরিকার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসল। হাত তুটো মাটিতে পেতে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সমরেশের চোখ তুটির দিকে।

লোকটির মাথায়, চোখের ঠিক উপর পর্যন্ত ঢাকা একটি আশ্চর্য

শিরস্ত্রাণ। তার নীচের দিকে গাঁথা একটা মস্ত ক্রীষ্ট্যাল, সারাটা কপাল জুড়ে ঝকমক করছে।

লোকটি তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমরেশের চোখের দিকে চেয়ে থেকে, হাত দুটি তুলে, নিজের মাথার পিছন দিকে শিরস্ত্রাণের উপর হাত রাখল।

নিমেষে একটা চোখ ধাঁধানো তীব্র আলোর ঝলক দিয়ে, সেই ক্রীষ্ট্যালটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। নিদারুণ শঙ্কায় সাগরিকা ত্রস্তে স্বামীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, নিজে সেই বৃদ্ধের সম্মুখে এগিয়ে দাঁড়াল। ক্ষিপ্রহাতে রশ্মিপিস্তলটা টেনে নিয়ে সেটা উঁচিয়ে ধরল সেই বৃদ্ধের বুকের উপর। স্বামীর নিরাপত্তার জন্যে নিদারুণ উদ্বিগ্ন, লাবণ্যময়ী তরুণীটির দিকে চেয়ে, সহসা ঠাণ্ডাগলায়, খুব সম্ভ্রমভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে উঠল—মা! ভয় পাবেন না। ফ্ল্যাস-ক্রীষ্ট্যালের কাজ শেষ হয়ে যেতেই ওটা ভেঙে পড়েছে। ওটা অন্য কিছু নয়।

অপরিমেয় বিস্ময়ে নাগরিকা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। সমরেশ জিজ্ঞেস করলে—আপনি আমাদের ভাষা জানলেন কি করে? আপনি কি ..?

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল।—না। যা ভাবছেন, তা নয়। আমি পৃথিবী থেকে আসিনি। আমি এই "তরভা" গ্রহেরই মানুষ। আপনাদের ভাষাটা আমি এই মাত্র শিখেছি।

—এই মাত্র?

—হ্যাঁ। টেলিপ্যাথী-ক্রীষ্ট্যাল, আর কম্পুটার নকল-নার্ভের সাহায্যে। আমার এই মস্ত টুপিটার মধ্যে একটা ছোট কারখানা আছে।

—আপনি কে? বৈজ্ঞানিক?

—আমি এদেশের একজন অতি সাধারণ মানুষ। আমার নাম আকুভ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ চিন্তাপাঠকারী। যে কোন লোকের চোখের দিকে চেয়ে, কিম্বা মাত্র তার কাছে এসে, তার দিকে না

তাকিয়েও তার মনের চিন্তা পড়তে পারি আমি।

—তাই বুঝি? কিন্তু ব্যাপারটা কি ধরনের?

—ব্যাপারটা মোটামুটি হলো, চিন্তার রূপটা ভাষাবদ্ধ করা আপনাদের চিন্তাধারা চিনে নিতে আমার এক পলক লাগে নি। সেই চিন্তাটা ভাষায় রূপান্তরিত করে নেওয়ার জন্যেই এই টুপিটার সাহায্য নিতে হয়েছে। এর ভেতরের যন্ত্রপাতি আপনাদের ভাষার বিশেষতরঙ্গটি আমার মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করেছে। তার ফলে, আপনার দৃষ্টির মাধ্যমে, আপনার মগজের ভাবনা এবং ভাষা দুই-ই আমি জানতে পেরেছি, ঐ ফ্ল্যাস-ক্রীষ্ট্যাল মারফৎ আর তরঙ্গ-ছবি নিয়ে।

সমরেশ ও সাগরিকা আশ্চর্য হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—একটু দাঁড়ান। বলে, আকুভ পিছন ফিরে অজানা ভাষায় চীৎকার করে কি বললে লোকজনদের। তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে, আনন্দধ্বনি করতে করতে আগন্তুকদের অভিবাদন জানিয়ে চলে যেতে লাগল।

এবার সাগরিকার দিকে ফিরে আকুভ বললে—প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই, মা। আমাদের তিনজনের মন এখন একই স্রোতের মধ্যে, একই তরঙ্গের উপর রয়েছে। আপনাদের কার মনে কি কথা উঠছে, তা আমি সঙ্গে সঙ্গেই টের পাচ্ছি।

আপনারা কেউ আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন না কেন? প্রথম, আপনারা এই বিদ্যা জানেন না। চিন্তার স্রোত চেনা শিখতে হয়; অভ্যাস করতে হয়। দ্বিতীয়, আমার চিন্তাধারাকে ভাষায় রূপ দিতে পারবেন না এখন। কারণ, আমাদের ভাষা আপনারা এখনো জানেন না।

আচ্ছা, এবার আসুন আমার সঙ্গে। আপনারা এই গ্রহে অতিথি। শুধু অনুসন্ধিৎসা আপনাদের টেনে এনেছে এখানে। আমাদের কোন রকম ক্ষতি করার ইচ্ছা আপনাদের নেই। যেটুকু কৌতুক করেছেন, তার জন্য এখন লজ্জিত। তাই না?

আকুভের পিছনে চলতে চলতে সমরেশ ও সাগরিকা একবার সলজ্জভাবে তার দিকে চাইল।

আকুভ সম্মুখে দৃষ্টি রেখেই এগিয়ে চলেছিল। সেই বিমান-বিধ্বংসী কামানটার দিকে সমরেশ একবার ফিরে চাইল। অমনি আকুভ বললে —হ্যাঁ। ওটা সুদীর্ঘ দিন অব্যবহারে অকেজো হয়ে গেছে। বহু বৎসর মারণাস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হয়েছে এই গ্রহে। সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আজ প্রায় ত্রিশ বছর হলো। কিছু পুলিশ আছে। তাও কোন দরকার হয় না। ওদেরও এবার ছেড়ে দেবার দাবী উঠেছে পার্লামেন্টে।

—বলেন কি? মিলিটারা নেই, পুলিশ থাকবে না। রাজ্য চলবে কি করে?

—মানুষের সংসার যেভাবে চলে। কারও বাড়ীতে কি পুলিশ মিলিটারীর সাহায্য নিতে হয় সংসার চালাতে? আমাদের এই গ্রহেও এখন তেমনি একটি মাত্র রাজ্য তরভা। তাই মিলিটারী নিষ্প্রয়োজন। আর স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায়, এর সমস্ত কাজকর্ম গৃহস্থবাড়ীর শৃঙ্খলায় চলছে। তাই এখন পুলিশেরও আর কোন দরকার নেই।

সমরেশ সবিস্ময়ে বললে—আপনাদের এই অবস্থায় উত্তরণ সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পরিবেশে পৌঁছলেন কি করে?

আকুভ মৃদু হেসে বললে—সে অনেক কথা। এখন আসুন। এই এখানকার সাধারণ ভোজনাগার।

আধুনিক রুচিসম্মত একটি রেষ্টুরেন্ট। সেখানে তিনজনে এসে বসতেই, দুজন ওয়েটার ব্যস্তভাবে ছুটে এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। আকুভ ওদের ভাষায় কি নির্দেশ দিতেই তারা নানাবিধ খাদ্য-পানীয় এনে পরিবেশন করতে লাগল।

সমরেশের দিকে চেয়ে আকুভ বললে—নিন। যেসব খাদ্য-পানীয় আপনাদের স্বাদের অনুরূপ মনে হয়, কিছু গ্রহণ করুন।

আশ্চর্য হল সমরেশ। অবাক হয়ে গেল সাগরিকা। প্রায় সমস্ত

খাদ্যই ভারতীয় স্বাদের, গন্ধের। নভো ষ্টেশন থেকে সসার নিয়ে বেরিয়ে আসার আগে কখন খেয়েছিল। ক্ষুধায় জ্বলছিল তুজনেরই পেট। খুব খেলো ওরা।

বেরুবার সময় লক্ষ্য করল, আকুভ খাদ্যের জন্যে কোন মূল্য দিল না। তবু ওয়েটার খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে স্যালুট করল।

পথে নেমেই আকুভ বলতে লাগল—কিছু ভাববেন না। এটি দাতব্য রেষ্টরেণ্ট। সরকারের খরচে চলে।

—দাতব্য রেষ্টুরেণ্ট? বিনামূল্যে যে কেউ খেতে পারে এসে?

—হ্যাঁ!....চলুন, এবার শহরে যাই।....আপনাদের সসার? না। কোন চিন্তা করবেন না। কেউ হাত দেবে না ওতে!

পথের ধারে কয়েকটি সুন্দর মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। একটিতে অতিথিদের নিয়ে উঠে বসল আকুভ। গাড়ী চলতে লাগল। পথের তুপাশে বিচিত্র গঠনের ঘরবাড়ী। নানা আকারের পার্ক, পুকুর, খেলার মাঠ।

সর্বত্রই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুখী মানুষ জন। ফুল, ফল, হাসি, গানে ভরা এ এক আশ্চর্য জগৎ।

দেখতে দেখতে বিস্ময়ান্বিত আনন্দে সমরেশ আকুভের দিকে ফিরে চাইতেই সে মৃত্থ হেসে বললে—ভাবছেন, স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির এই স্বর্গ আমরা গড়েছি কি করে। তাই না?

—হ্যাঁ।

—তবে শুনুন। আমার ছেলেবেলায়, এই তরভা গ্রহের চেহারা এমন ছিল না। তখন এর ভূগোল, এর ইতিহাস তুই ছিল আলাদা। সে সময় ছোট বড় অনেক রাষ্ট্রে, অনেক জাতির বাস ছিল। এই তরভায়। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। সারাটা তরভা, শাসন, শোষণ আর প্রবঞ্চনায় জর্জর হয়ে উঠেছিল। ধনীরা হচ্ছিল আরও ধনী, গরীবেরা আরও গরীব।

—কেন? এখানে গণতন্ত্র ছিল না?

—ছিল। কিন্তু তা মানুষের আয় বাড়াতে পারেনি। ভেজাল বন্ধ করতে পারেনি। সমাজের সমৃদ্ধির ন্যায্য অংশ দিতে পারেনি জনসাধারণকে।

—কি আশ্চর্য! তাহলে, সে যুগের রাষ্ট্রনায়কেরা কি করতেন?

—তাঁরা তরভার সেই মহান আত্মার নাম নিয়ে, মানুষকে মিষ্টি বক্তৃতার বন্যায় ভাসিয়ে দিতেন। কথায় কথায় লোককে সোণার হরিণ দেখাতেন। আর ভাত চাইলে, কিল মারতেন কসে।

—সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশার কোন প্রতিকার........

—কি জানেন, তাঁরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হলেও অধিকাংশই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অ-সাধারণ ব্যক্তি। ঐসব কালো-বাজারী আর ভেজালদাতাদের প্রতিনিধি হয়েই তাঁরা দুঃশাসনের কপট পীড়ন চালিয়ে যেতেন। তাঁদের দেশপ্রেম ছিল, দারোগাবাবুর হংসীপ্রেমের মত! ডিম্বকেন্দ্রিক!

—জনসাধারণ সাধারণ মানুষদের কেন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেণ্টে পাঠাতো না?

—নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে, যত টাকা খরচ করতে হতো, সে টাকা কে দেবে? যে দেবে, সে মাথাটা কিনে নেবে নাকি?

—কেন? পার্টি দিতে পারে না?

—পার্টি, পাবে কোথায়? ধনী আর কালোবাজারীদের কাছেই তো! সুতরাং ঘুরে ফিরে সেই গুড়ের গাছের গোড়ায়!....অবশ্য ধনীমাত্রেই খারাপ, বেদরদী ছিল, তা বলছি না। কিন্তু তাদের মহাপ্রাণতা যতই থাক, দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকেরই ছিল না। সে যুগে দেখতুম, যারা মাসে দু হাজার টাকার মদ খেতো, আর পাঁচ দশহাজার টাকা অন্যান্য ফুর্ত্তিতে ওড়াতো—তারা কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে, যারা একশো দেড়শো টাকায় পাঁচ-দশজনের সংসার চালায়, তাদের দুঃখটা কোথায়! অসহায় বেকারদের বুকে হতাশার, নৈরাশ্যের যে আগুন জ্বলে, তার স্বরূপটা কি!

যার একটা ছেলের পিছনে মাসে দু-পাঁচহাজার টাকা খরচ হয়; পোষা কুকুর বেড়ালের বিয়ে দিয়ে যে লাখ টাকা উড়িয়ে দেয়, সে কি কোনদিন স্বপ্নেও ধারণা করতে পারে যে,—নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে একমুঠো ভাত দিতে না পেরে, স্নেহময় পিতা কোন্ উদ্‌ভ্রান্তিতে, কোন্ দুঃসহ যন্ত্রণায় তাকে ফুটপাতে আছড়ে মারে? কি নিদারুণ জ্বালায়, কোন মা সজ্ঞানে তার নিজের বুভুক্ষু সন্তানের মুখে বিষ দেয়?

তারা নিজেদের ভণ্ডামী, নিজেদের ব্যর্থতা, নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার চেষ্টায়, সেই সব লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত, নিঃস্ব, শোষিত মানুষদেরই গাল দিয়ে বলতো "দেশদ্রোহী"! অর্থাৎ সেই ভাগ্যবানদের পরোক্ষে বিরোধিতা করাটাও অপরাধ। দেশ বলতে তারা বুঝতো—তাদের নিজেদের দলের কায়েমী কুৎসিত স্বার্থ!

উদ্বিগ্নভাবে সাগরিকা জিজ্ঞেস করলে—তারপর? আবেগ উচ্ছ্বাস সংযত করে, আকুভ মৃদু হেসে বললে—তারপর ...তারপর এলো সেই মহান অভ্যুত্থানের দিন।

সারা তরভা তছনছ হয়ে গেল সেই প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানে। কৃষক মজুর, বুদ্ধিজীবির কোন পার্থক্য রইল না। ছোট বড় সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতি মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

—সেটা কতদিন আগে?

—আজ থেকে চল্লিশ বছর।

—তারপর কিভাবে দেশকে গড়লেন?

—বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা আর নিশ্চয়তা দিয়ে। প্রতিটি মানুষের পক্ষে, প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বস্তু অনায়াসলভ্য করে তোলাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, কর্ম, আরাম, চিকিৎসা এগুলির জন্য কারও কোন চিন্তার প্রয়োজন রইল না।... এসব কথা বলছি, অনেক দিন আগেকার ব্যাপার। এখন সারা তরভায় কারও কোন কিছুর অভাব নেই। ভবিষ্যতের জন্য কারও ভাবনার কিছু নেই। এখন স্বার্থবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই কোথাও

কোথাও কোন দুর্নীতির চিহ্নমাত্র নেই সারাদেশে। প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, সুখী।

—হ্যাঁ। চতুর্দিকেই দেখছি হাসি, গান, আর আনন্দ উৎসব।

—সমৃদ্ধ তরভা এখন "সব পেয়েছির দেশ।"

এই সময় গাড়ী একটি বিশেষভাবে-সজ্জিত বাজারের সুমুখে এসে পড়তেই আকুভ ড্রাইভারকে অজানা ভাষায় কি নির্দেশ দিল। খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চলতে লাগল। সমরেশ ও সাগরিকার দিকে ফিরে আকুভ বললে—এই বাজারটি দেখুন। এর নাম সর্বঘণ্ট বাজার। সব-রকম জিনিস এখানে পাওয়া যায়। শুধু এই প্রধান শহরেই নয়, তরভার প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে এক একটি সর্বঘণ্ট বাজার আছে।

সমরেশ ও সাগরিকা দোকানগুলি দেখতে দেখতে উত্তরোত্তর আশ্চর্য হতে লাগল। সারি সারি দোকানগুলি নানাবিধ ভোগ্য উপকরণে ভর্তি; অথচ কোথাও খরিদ্দার নেই। ক্বচিৎ দু'একজন লোককে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। আর দোকানীদের সে কি সাগ্রহ ডাকাডাকি! সবিস্ময়ে সাগরিকা জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার বলুন তো? এত জিনিস রয়েছে, অথচ কেনবার লোক নেই!

মৃদু হেসে আকুভ বললে—এখানে সমস্ত দোকানই দাতব্য-ভাণ্ডার। যার যা দরকার, সব বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেই লজ্জা মাথায় তুলে নিতে কেউ চায় না। যাঁর নেহাৎ অন্য কোন উপায় নেই, শুধু তেমন লোকই আসেন।

—কিন্তু দোকানদারেরা তো দেখলাম, খুব খাতির করে ডেকে, বেশ যত্নের সঙ্গেই জিনিস দিচ্ছে?

—তা তো দেবেই। ওরা যে পাবলিক-সার্ভেন্ট। এই কাজের জন্যেই সরকার থেকে বেতন পায়।

—আচ্ছা, এই সুযোগে কোন দোকানদার বা কোন খদ্দের যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে?

—স্থানীয় জনতার বিচারে, তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং

সপরিবারে প্রাণদণ্ড হবে। তবে তা প্রায়ই হয় না। কারণ কারও কিছু অভাব নেই। আর ভবিষ্যতের জন্যেও সকলেই নিশ্চিন্ত। নিজের-এবং পরিবারবর্গের খাওয়া পরা, শিক্ষা, চাকরী, চিকিৎসা, বিশ্রাম সব কিছুরই নিখুঁত ব্যবস্থা রয়েছে সারা দেশে। কারও দুর্নীতির আশ্রয় নেবার দরকারটা কি?

—অভাবে না হোক, স্বভাবে?

—স্বভাব-দুর্বৃত্ত? শিক্ষা, অভ্যাস, আর পরিবেশের গুণে, এযুগের অধিকাংশ মানুষই সত্যাগ্রহী।...ওঃ! সেই মহান অভ্যুত্থানের আগেকার অবস্থা চিন্তা করলে, এখানে গায়ে কাঁটা দেয়! দেশটা যেন কালো-বাজারী আর ভেজালদারদের নরক হয়ে উঠেছিল। ভেজাল খেয়ে খেয়ে, মানুষের স্বভাব চরিত্র, ভাবনা চিন্তাও ভর্তি হয়ে গিছল ভেজালের রসে!

—ভেজালদাতাদের শাস্তি দিতেন না কেন?

—আইন ছিল না।

—আইন তৈরী করেন নি কেন?

—কে করবে?

—কেন? আইন সভার সদস্যেরা।

একটুখানি রহস্যময় মুচকি হাসি হেসে আকুভ বললে—মা! সে যুগের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন, ভেজালদাতাদের টাকায় ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া; আর না হয়, নিজেই একজন বিশিষ্ট ভেজালদাতা! তবে হ্যাঁ, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আর তাদের ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্যে ঐসব মাননীয় সদস্যেরা আইনসভার বাইরে, মাঠে ঘাটে, নির্বাচনী বক্তৃতায় অজস্র প্রতিশ্রুতি দিতেন। ভেজাল-দাতাদের শাস্তি দেবার কথা বলতেন। কিন্তু আশ্চর্য! বছরে বছরে দিস্তা দিস্তা আজেবাজে নতুন আইন তৈরী হলেও ভেজালদাতাদের শায়েস্তা করার মত উপযুক্ত আইন কোনমতেই তৈরী হতে পারেনি।.... যদি বিবেকের দংশন সহ্য করতে না পেরে, কোন মন্ত্রী বা কোন সাধারণ

সদস্য সত্যি চেষ্টা করতেন তেমন কোন আইন আনতে, তাহলে বিচিত্র ভানুমতীর খেলায় সেই হৃদয়বান সদস্যকে মন্ত্রিসভার এবং আইনসভার বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হতো! দু'দিন একটু ঢেউ উঠত গণমন সমুদ্রে। তারপর সেই মূর্তিমান হতমান হয়ে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতেন। সেই পরিণাম অবধারিত বুঝতে পেরেই সদস্যেরা এবিষয়ে সচেতন হয়ে কাজ করতেন।....যাকগে, সে সব পুরানদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলে আর কি হবে! এখন এদেশে ভেজাল দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

—কেন?

—কারণ আছে তিনটি। প্রথম হলো, আসল জিনিসের উৎপাদন এত বেশী যে, নকলের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার কোন উপায় নেই। তৃতীয়, সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী, স্থানীয় জনসভার বিচারে অপরাধীদের সপরিবারে প্রাণদণ্ড এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ সব বাজেয়াপ্ত সম্পতি দাতব্য সর্বঘণ্ট বাজারে দিয়ে দেওয়া হয়।

—অহ। কিন্তু একটা কথা। সপরিবারে প্রাণদণ্ড কেন?

—এরও কারণ দ্বিবিধ। প্রথম, পরিবারবর্গ সুখে থাকবে, এই চিন্তায় নিজের মৃত্যুদণ্ড উপেক্ষা করে, কেউ দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার সান্ত্বনা পাবে না নিজের বিবেকের কাছে।

দ্বিতীয়, নিজেদের প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, পরিবারের লোকজনও সর্বদা চেষ্টা করবে, যাতে কেউ লোভের বশে অন্যায় কাজ না করে।

—বুঝেছি। স্বভাব, প্ররোচনা দুই-ই বন্দী। তার উপর, নিজের পরিবারবর্গেরই অনিবার প্রহরা। যার জন্যে চুরি করতে যাবে, সেই বলবে চোর!

আকুভ হেসে বললে—ঠিক বলেছেন। আর একটা বড় জিনিস হল, জনসভার বিচার। অপরাধী তার পাপ-লিপ্ত হাতগুলি ধুয়ে ফেলার সময় বা সুযোগ কিছুই পায় না....অবশ্য, এসব অনেক আগের

দিনের কথা। এখন এদেশে সকলেই সুখী, সকলেই সত্যনিষ্ঠ।

এই সময় একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে এসে গাড়ীটি দাঁড়লে। আকুভ নেমে দাঁড়িয়ে, অতিথিদের অভ্যর্থনা করে বলল—আসুন! এইখানেই আমি থাকি। যে ক'দিন ইচ্ছা, আপনারাও এখানে থাকবেন।

বিরাট স্ফটিক প্রসাদের দিকে চেয়ে, তার গঠন-নৈপুণ্য এবং কারুকলা দেখে বিস্মিত হল সাগরিকা।

—এই আপনার বাড়ী?

মৃদু হেসে আকুভ বললে—আমার নয়, আমাদের সকলের। এটি এই শহরের গণভবন। দাতব্য হোটেল। যে-কোন লোক একা বা সপরিবারে এখানে বিনামূল্যে থাকতে খেতে পায়।

গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সাগরিকা। সমরেশ প্রশ্ন করার আগেই তার দিকে চেয়ে আকুভ উত্তর দিল—হ্যাঁ। প্রত্যেকটি শহরে আর গ্রামে, একটি করে গণভবন আছে!....না। কোন গণভবনে থাকতে খেতে কারও কোনও অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

—আশ্চর্য!

—আসুন!

দোতালার উপর একটি সর্বসুবিধাযুক্ত প্রশস্ত কক্ষে সমরেশ ও সাগরিকায় থাকার বাবস্থা করে দিয়ে, আকুভ বললে— আমি এর পাশের ঘরেই থাকি। আপনারা স্নানাহার সেরে নিয়ে আসবেন; বসে গল্প করবো।

দুজন পরিচারক এসে সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে গেল ওদের। স্নানের ঘরের পাশেই নতুন পোষাকের ঘর। সেখানে বিভিন্ন মাপের পরিচ্ছদ সাজানো।

সমরেশ ও সাগরিকা স্নান সেরে, নতুন পোষাক পরে নিল। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আকুভের ঘরে এল। একথা সেকথার পর, শহর দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল সাগরিকা।

কিছুটা কুণ্ঠিতভাবে সমরেশ বললে—আমাদের সসারটা আগে একবার দেখে আসি চলুন। অটোমেটিক লকে ওর দরজাটা বন্ধ আছে।

আকুভ মৃদু হেসে বললে—কোথাও যেতে হবে না। আরাম করে ঐ সোফাতেই বসে থাকুন। বীক্ষণযন্ত্রে সব কিছুই দেখাচ্ছি।

দেয়াল সংলগ্ন একটি বৃহৎ আধারে রক্ষিত, টেলিভিশনের মত দেখতে, একটি যন্ত্র চালু করে দিল সে। মুহূর্তে সম্মুখের পর্দায় পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠল। সেই ময়দানের চিত্র। খুব নিকট থেকে দেখা যাচ্ছে সসারটিকে।

একদল লোক কৌতূহলী হয়ে দেখছে নভোযানটি। ওদের মধ্যে থেকে দুজন স্বেচ্ছাসেবক পাহারাদারের কাজে লেগে পড়েছে।

এরপর আকুভ সেই যন্ত্রের একটা নব্ ঘোরাতে লাগল। দৃশ্যের পর দৃশ্য এগিয়ে চলল শহরের পথে। বোধ হতে লাগল যেন, কোন গাড়ীতে চড়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছে ওরা।

সমরেশের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় দেখা সেই ম্যাজিক-লণ্ঠন বায়স্কোপের কথা। ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে আকুভ বলে চলেছে—এই আমাদের শিল্পকেন্দ্র মন্দির দেখুন। এই দেখুন কালোবাজারী আর ভেজালদাতাদের ফাঁসিমঞ্চ সংলগ্ন মনুমেণ্ট। এইখানেই স্থানীয় জনসভার বিচারে শাস্তি দেওয়া হতো ওদের।

তারপর এই দেখুন, মহান অভ্যুত্থানেব স্মৃতিসৌধ। এই গণমন্দির। এই আমাদের কন্যাদের জন-স্বয়ম্বর ভবন। এখানে বছরে দুবার উৎসব হয়। সেই উৎসবে, কুমারী কন্যারা নিজেদের মনোমত স্বামী নির্বাচন করে নেয়। উৎসবের সময় কোন বিবাহিত পুরুষ বা মহিলার প্রবেশাধিকার থাকে না এখানে। বিবাহেচ্ছু বিপত্নীকেরা, বছরের যে কোন সময়েই যে কোন বিধবার অনুমতি নিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে। তাদের জন-স্বয়ম্বর ভবনে আসার প্রয়োজন নেই।

সমরেশ সহসা বাধা দিয়ে, রগড় করে বললে—আচ্ছা মশাই, যদি

কোন যুবককে পছন্দ করে, দশ-বিশজন কুমারী মেয়ে তাকে ছেঁকে ধরে? তখন?

—সে অবস্থায় যুবক যাকে পছন্দ করবে, সেই তার স্ত্রী হবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাগরিকা স্বামীর দিকে একটা তির্যক-দৃষ্টির ফুলশর ছুঁড়ে মারল।

আকুভ বলতে লাগল—তারপর এই দেখুন কাজ-মহল। এই ভাগ্যযন্ত্র-ভবন।

সাগরিকা কৌতূহলী হয়ে বললে—দাঁড়ান? দাঁড়ান! হাত থামিয়ে আকুভ তার দিকে ফিরে চাইল।

সাগরিকা বললে—ভাগ্যযন্ত্র ভবন মানে? আপনারা ভ্যগ্য মানেন?

—কেন মানবো না? এটা তো মহাজাগতিক সত্য। আপনার প্রশ্নের ধরন দেখে বোধ হচ্ছে যে, আপনাদের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে এখনো পাঠশালার ছাত্র!

ধাক্কাটা হজম করে সাগরিকা বললে—আমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অন্য নানা বিষয়ে ব্যস্ত। নিজেদের ভাগ্য নিয়ে ভাববার তাঁদের সময় নেই। তাঁরা নিজেদের সাধনায়, জাতির ভাগ্য গড়ে চলেছেন।

সমরেশ বললে - আমাদের দেশের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা অনেকে ভবিষ্যত দর্শন করতে পারতেন। কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, জগতের বহু ঘটনা পূর্ব-নির্ধারিত।

আকুভ আশান্বিতভাবে বললে—ঐতো চাবিকাঠি পেয়েছেন। ভবিষ্যতে কি হবে, সেটা আগে জানতে পারা মানেই হলো যে, সেই ঘটনাগুলি পূর্ব-নির্ধারিত। তা', কিভাবে পৃথিবীর লোক ভবিষ্যতের ঘটনা জানতে পারেন?

সমরেশ বললে—আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্রের জন্মের আগেই ঋষি বাল্মিকী রামচন্দ্রের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি ধ্যানযোগে জানতে পেরে, রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

—তাই নাকি? তা' ঐ ধ্যানযোগ যন্ত্রটা এখন নেই?

—ওটা যন্ত্র নয়, মন্ত্রসাধনা। মহাজাগতিক চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনার সংযোগ। এসব আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

—অহ! সর্বসাধারণের জন্য নয়?

—সর্বসাধারণের জন্যে আছেন, জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা। তাঁরা মানুষের ভাগ্যগণনা করে বলে দেন। জন্মের সময় ধরে, রাশিচক্র বিচার করে, কিভাবে ওঁরা মানুষের ভাগ্যফল বলে দেন, তা আমি সঠিক জানি না। এ ছাড়া, অনেকের স্বপ্নে দেখা ঘটনা, পরে হুবহু ঘটতে দেখা গেছে।

—অহ্। যাই হোক, প্রত্যক্ষ কোন সহজ পদ্ধতি বা যন্ত্র নেই।

—না। আর একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের মধ্যে অর্জ্জুনের ভবিষ্যত-দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আমি আগেই ওদের নিধন করেছি"—অর্থাৎ ওরা যে এই যুদ্ধে নিহত হবে, সেই তথ্যটি পূর্ব-নির্ধারিত। "হে সব্যসাচী! তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হও।"

আকুভ আপশোষ করে বললে—কি আশ্চর্য! আর কি দুঃখের কথা। এত সূত্র থাকতেও আপনাদের ব্যস্ত বিজ্ঞানীদের কারও দৃষ্টি পড়েনি এই মহারহস্যময় সত্যের দিকে! এদিকে তো সসার বানিয়ে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছেন! এর চেয়ে বেদনার্ত আশ্চর্য আর কী আছে?

সমরেশ সসম্ভ্রমে বললে—এসেছি বলেই তো এমন "সব পেয়েছির দেশ" দেখতে পেলাম। আচ্ছা, এখানে সকলেই কি নিজের নিজের ভবিষ্যত দেখতে পারে?

—হ্যাঁ। যন্ত্রের ভেতর প্রায় প্রত্যেকেই নিজের ভবিষ্যত দেখে নেয় মাঝে মাঝে। সেই অনুসারে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়। দশদিকে অকারণ ঢুঁ মেরে, নিজের আয়ু আর উদ্যম শেষ করে না। এইজন্যেই তরভার মানুষ এত শান্ত, এত নিশ্চিন্ত, এত নির্লোভ; আর এমন সত্যনিষ্ঠ।

সাগরিকা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল। তার দিকে চেয়ে

আকুভ মৃদু হেসে বললে—মা-মণি খুব অবাক হয়ে গেছেন। না? এদেশের মানুষ কিন্তু এ যুগে আশ্চর্য হতে ভুলে গেছে। ভবিতব্য দেখে দেখে, আর নিরুত্তাপ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে, এদেশে যেন একটা স্থবিরতা এসে গেছে। চিন্তাশক্তিতে, উদ্ভাবনীশক্তিতে ছাতা ধরে গেছে।

—কিন্তু এ তো বেশ মজা! কারও কোনও সমস্যা নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। কি হবে না হবে, আগে থেকেই সব জেনে নেয়। বা! আমাদের এই গ্রহের নাগরিক করে নিন না। নেবেন?

—আপনারা আশ্চর্য-পিপাসা মানুষ। এখন নতুন কিছু দেখছেন, তাই এত ভাল লাগছে। বেশ! থাকুন আপনারা যতদিন খুশি।

সেইদিনই আকুভ ক্রীষ্ট্যাল-শিরস্ত্রাণ যন্ত্রের সাহায্যে তরভা গ্রহের ভাষাটা সমরেশ ও সাগরিকাকে শিখিয়ে দিল। আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে টেলিভিশনের মাধ্যমে ওদের বন্ধুত্বের পরিচয়টা জানিয়ে দিল সমস্ত দেশবাসীর কাছে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাগরিকার। চোখ মেলেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে খুব উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে ঘরে। সে বিস্মিত হয়ে বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। বাইরে আকাশের দিকে চেয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তিনটি পূর্ণচন্দ্র জ্বলজ্বল করছে আকাশে। বৃদ্ধ যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল, সেই ভাবে একটা হাতলে মোচড় দিল সাগরিকা। সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উপরের কালো রঙের প্লাষ্টিকের আবরণী পর্দাটা সরে গেল। কাঁচের মত স্বচ্ছ ছাদের তলায়, সারাটা ঘরে পলকে আলোর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। সাগরিকা হতবাক। মাত্র তিনটে নয়, চারটে। আকাশ জুড়ে একই সঙ্গে সাতটা পূর্ণিমার চাঁদ আলো দিচ্ছে।

পরদিন আকুভের কাছে শোনা গেল—আকাশে বিরাট আকারের মোট বারটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন ভাবে সময় হিসেব করে ছাড়া হয়েছে, যাতে সারারাত্রির মধ্যে সব সময়েই আকাশে

সাতটি চাঁদ দেখা যাবে। এই কারণেই সমস্ত বসতবাড়ীর স্বচ্ছ ছাদের উপরে কালো পর্দার আবরণ দেওয়া। আর পথে ঘাটে, কলকারখানায় কাউকে একটিও বাতি জ্বালতে হয় না।

কিশোরী বালিকার মতই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে সাগরিকা বললে—কী আশ্চর্য! আর কী মজা! আচ্ছা, এই গ্রহের কোন আসল উপগ্রহ নেই?

—আসল না থাকলে, নকল হলো কি করে?

—আসল চাঁদের বুঝি এখন অমাবস্যা?

—ঠিক তাই।

সেদিন সমরেশ সাগরিকাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে, আকুভ বললে—তরভার ভাষা শিখেছেন, আর ভাবনা কি? যেখানে ইচ্ছে ঘুরে আসুন। তবে হ্যাঁ। সব সময় দাতব্য জিনিষ নেবেন। এদেশের টাকা তো আপনাদের নেই। নীল রঙের ট্যাক্সি নেবেন। যেখানে খুশি যাবেন। ভাড়া লাগবে না।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমরেশ ও সাগরিকা গণভবন থেকে বেরুল। কয়েকটা নীল রঙের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল নিকটেই।

ওরা একটি ট্যাক্সিতে উঠে বলে—আমরা এই শহরের এবং শহরতলীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে চাই। সুদক্ষ ট্যাক্সিচালক এদের নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল।

ওরা সবচেয়ে আশ্চর্য হল, একটি কারখানায় এসে। বিরাট কারখানা। কিন্তু ম্যানেজার, সুপারভাইজার কিম্বা ডিপার্টমেণ্ট ইনচার্জ নেই। কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে প্রচণ্ড উদ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। শুনল, এইসব কারণে উৎপাদনের খরচও খুব কম হয়।

এরপর ওরা এল ভাগ্যযন্ত্র ভবনে। সেলুনের মত দেখতে অনেকগুলি সারি সারি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের ছাদ থেকে একটি করে প্রকাণ্ড বিচিত্র যন্ত্র ঝোলানো রয়েছে। সবচেয়ে নীচের অংশে দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত ধরনের একটি কম্পুটার মেসিন। তার সঙ্গে কয়েকটি ফটো

প্রোজেকসন সেল। আর যেসব সূক্ষ্ম কলকজ্জা রয়েছে, তা ওদের অচেনা।

একটি ঘরের নীল দরজা দেখে, ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তখনই একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ওদের সাদরে ডেকে বসালো ঘরের মধ্যে।

সমরেশ জিজ্ঞেস করলে—ভাগ্য জানবার খরচ কত ?

ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিল—এখানে বিনামূল্যে। অন্যত্র এক টাকা।

কৌতূহলী হয়ে সাগরিকা জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি রকম, আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

—কেন বলবো না ? এর মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই।

—তাহলে দয়া করে বলুন।

—প্রত্যেকটি মানুষের দেহে আত্মা আছে। এই আত্মার চেহারা কিন্তু হাত-পাওয়ালা মানুষের মত নয়। তাকে একটুকরো অদৃশ্য আলো, বা স্ফুলিঙ্গ বলতে পারেন। তা থেকে সব সময় শক্তিস্পন্দন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি আত্মার আলোর রঙ স্বতন্ত্র। তার সঙ্গে, চুম্বকের অঙ্গে জড়িয়ে থাকা লৌহচূর্ণের মত, মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল জড়িয়ে থাকে। আর সেইগুলির হিসেব অনুযায়ী, ভবিতব্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটা অটোমেটিক। আর অবধারিত। কেবল ঈশ্বর, আর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সেই নিয়তিকে কিছু অদলবদল করতে পারে।

—আচ্ছা, এই যন্ত্রের মধ্যে যে হিসেব তৈরী হয়, তার মূলটা কি ? মানুষের জন্মসময় ?

—সেটা তো খোসা। ছোবড়া। তাতে অবশ্য ফলের গন্ধটা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে প্রকৃত ফলটি নিয়েই কারবার। তাই একেবারে নির্ভুল। প্রত্যক্ষ। তা হলো, সেই আত্মার আলোর রঙ। তার স্বতন্ত্র বর্ণালী। ব্যাপারটা কিরকম জানেন ? মঞ্চে অভিনয় হওয়ার আগেই রিহার্সাল রুমে কোন নাটকের দু'একটা টুকরো দৃশ্য দেখে নেওয়ার মতো।

—কিন্তু সেই অদৃশ্য আত্মাকে আপনারা দেখবেন কি করে ?

—আমরা কেন দেখব ? যে ভাগ্য দেখতে চাইবে, সে দেখবে। সূর্যের আলোর রঙ মানুষ দেখতে পায় না কি ? রামধনুর রঙগুলি কিসের রঙ ? আতস কাঁচের ভেতর যে রঙ দেখা যায়, তাও কি সূর্যালোকের নয় ?

সেই প্রক্রিয়ায়, এক্স রে এবং এডি রের সাহায্যে এই যন্ত্রের মাধ্যমে যেকোন মানুষের দেহস্থ আত্মার রঙ আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মফলের এসেন্সটাকে বিশ্লেষণ করে, কম্পুটার মেসিনে ফেলা হয়। নিখুঁত সম্ভাবনাটি হিসেব করে, সে তার রূপটি ফটো সেলের মধ্যে প্রকাশ করে। আসুন! এই চেয়ারে বসুন! যার বিষয়ে, যে বিষয়ে ভবিষ্যতের কোন দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করবেন, নিজের চোখেই সেই দৃশ্য দেখতে পাবেন।

সাগরিকা হাসিমুখে সেই চেয়ারে এসে বসল। ভদ্রলোক যন্ত্র চালু করলেন। চেয়ারসুদ্ধ সাগরিকাকে ঢেকে দিয়ে, মেঝের উপর নেমে এল বিরাট যন্ত্রটা। সমরেশ বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে যন্ত্রটার বিচিত্র কাজকর্ম লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু বাইরে থেকে সাগরিকাকে, বা সে কী দেখেছে, তা দেখা গেল না। শুধু যন্ত্রটার উপরের দিকে এক স্থানে দেখা গেল, অসংখ্য সরু ও মোটা স্বচ্ছ নলের ভেতর হলুদ, বাদামী আর গোলাপী রঙের আলোর প্রবাহ যাতায়াত করছে। যেন সচল লাবণ্য লেখার অলস-লীলা!

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক যন্ত্রটি সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলেন। যন্ত্রের ভেতর আলোক প্রবাহ অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বিরাট যন্ত্রটা আবার উঠে গেল ছাদের কোলে।

কিন্তু একি! সাগরিকার মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে সে।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় সমরেশ তার কাছে উঠে যেতেই সে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—বাবা! আমার বাবা! সেই ভদ্রলোক

সবিস্ময়ে বললেন—কী আশ্চর্য! আপনি কাঁদছেন কেন? অস্থির হওয়ার কি আছে? যা সত্য যা অবধারিত তাকে বুঝি শান্তভাবে সহ্য করতে শেখেন নি আপনারা? তাহলে, ভবিষ্যতের ঘটনা দেখবার কৌতূহল হয়েছিল কেন? যাই বলুন, পৃথিবীর মানুষ কিন্তু খুব বোকা!

শুকদেবের মত নির্বিকার মানুষটির দিকে একবার শুধু তাকাল সাগরিকা। তারপর নিরুত্তরে কাঁদতে লাগল।

সমরেশ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেই সে অশ্রুলিপ্তস্বরে বললে—ওগো! এ আমি কী দেখলাম? কী ভয়ঙ্কর একটা আগুন। কত মানুষ যে পুড়ে মরছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার চোখের সামনেই আমার বাবা...বাবা···আমি কিছুই করতে পারলাম না।

সেই ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন—কি হয়েছে দেখলেন বলুন তো? এত নার্ভাস হ'য়ে পড়লেন কেন?

সাগরিকা ওদের ভাষায় সে যা দেখেছিল সে কথা বলল। ভদ্রলোক সব শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন—দেখুন, আপনি মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছেন। যা দেখেছেন, তা এখনো ঘটে নি। ভবিষ্যতে ঘটবে। এবং ঘটবেই। যা অবধারিত তাকে শান্ত মনে সহ্য করে নিন। নিয়তিকে মেনে নিন।

চোখ মুছে, নিজেকে কিছুটা সংযত করে সাগরিকা শুধাল—আচ্ছা, যা দেখলুম, তা কখন হবে?

—অহ্! সময় হিসেব করার কৌশলটা আপনাকে বলে দেওয়া হয় নি। আচ্ছা, আর একবার···

—না। না। দোহাই আপনার! সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না। বলতে বলতে সাগরিকা উঠে দাঁড়াল। উৎকন্ঠিত ভাবে সমরেশের হাত ধরে বলল: ওগো! কখন সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হবে, তা' আমি জানতে চাই না। চলো আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই। বাবাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

সমরেশ সপ্রেম আদরে তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—বেশ। চলো, আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই।

সেদিন বিকেলে আকুভকে সেকথা বলতেই সে পুলকিত বিস্ময়ে বললে—আপনাদের সব কিছুই আশ্চর্য লাগছে আমার! গ্রহান্তরে আসার উত্তম, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। সবশেষে আপনাদের আপনজনদের জন্যে এই মমতা, এই উদ্বেগ, এই দুশ্চিন্তা—আমার ভারী মিষ্টি লাগছে। অকারণ হলেও এই করুণা, অপরূপ আনন্দদায়ী! মিথ্যে হলেও বড়ই মায়া-মধুর!

এদেশের লোক কিন্তু হৃদয়াবেগের ধার ধারে না! সকলেই ভবিষ্যত জেনে নিয়ে, তা অনায়াসে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করে। কারও ইচ্ছা নেই; কোন কৌতূহল নেই।

তাই এযুগে মানুষের জীবন-যাত্রার মধ্যে যান্ত্রিকতা এসে গেছে। যেন সেণ্টার থেকে সঠিক পথে বল এনে, সোজা গোলে সট্ মারার মত। সহজ সঠিক অঙ্কের মত। নীরস, নিষ্প্রাণ।

কোথাও রোমাঞ্চ নেই, উদ্দীপনা নেই, রোমান্স নেই। শুধু পাওয়া আর পাওয়া। সব পাওয়ার মধ্যে "সব পেয়েছির দেশের মানুষ" হারিয়ে ফেলেছে তার মানবতাবোধ। এক-এক সময় আমার নিজেরই মনে হয়—আমি বুঝি মানবিক সত্তাহীন একটা মেসিন। দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা, কিম্বা পেণ্ডুলাম। চলছি, ফিরছি, কথা কইছি। কিন্তু ছকে বাঁধা। নির্ভুল যতিতে, নিয়মিত গতিতে বন্দী! দিনে আলো, রাত্রে আলো। চোখে আর কত সয়?

সাগরিকা সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বললে—আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি অন্ধকার নেই কোথাও?

—অন্ধকার? একটু দম নিয়ে আকুভ আবার বলতে লাগল আছে। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়। কিন্তু সেই গোপনে, সেই অন্ধকারে যারা থাকে; তারাও হিংসা ভুলে গেছে। তাদের যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভোগ্য, অন্ধকার পথে তাদের কাছে গিয়ে নিজে

থেকে স্তূপাকার হয়।

সাগরিকা জিজ্ঞেস করল—কারা থাকে সেখানে ?

আকুভ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—যেখানে শ্যাওলার মত স্বার্থমগ্ন কিছু জীব থাকে। ছুঁচো, সাপ, রক্তচোষ। বাদুড়, আর অলক্ষ্মীর বাহন গোমড়ামুখো প্যাঁচার দল। ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে অন্ধকারের ভেতর ওদের আরাম আয়েসের কায়েমী স্বত্ব।

যাতে অন্যকে দেখা, চেনা যায় ; নিজেরও পরিচয় প্রকাশ করা যায়, প্রকৃতির আশীর্বাদকে ওরা ভালবাসে সেই না। সেই কুৎসিত আলোকে ওরা ঘৃণা করে! অনেক মানুষও আছে এমনি।

—কী আশ্চর্য !

—হ্যাঁ। কিন্তু এই গ্রহের এ যুগের মানুষেরা আশ্চর্য হতে ভুলে গেছে। বৈচিত্র্য তারা পছন্দ করে না। যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে চির-বসন্ত বিরাজ করছে এখানে। কিন্তু তা কি চিরদিন ভাল লাগে ?

সমরেশ তার কথায় সায় দিয়ে বললে—ঠিকই বলছেন। কিছু আলো, কিছু হাওয়া, এই নিয়েই জীবনের পূর্ণতা। সাতরঙ রামধনু শুধু শিশুদেরই মন ভোলায় না, পরিণতদেরও প্রাণ জুড়ায়।

জীবনে বৈচিত্র্য চাই। যে মানুষ জীবনভোর শুধু হাসল, একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না কোনদিন, নিজের জন্যে কিম্বা পরের জন্যে একবিন্দু উদ্বেগ ভোগ করল না, সে তো একটা আগাছা! একটা পাথর।

আকুভ এবার আক্ষেপ করে বলতে লাগল—আমিই বোধ হয়, তরভার সবচেয়ে বেশী বয়সের মানুষ। আমার চেতনায় আগের দিনের সেই দুঃখ দৈন্য, সেই বেদনা-বোধ, সেই অনুসন্ধিৎসা মিশে আছে। তাই আজ পর্যন্ত আমি ঐ ভাগ্যযন্ত্রের পায়ের নীচে গিয়ে বসতে পারিনি। অতীত আর বর্তমানকে সহ্য করাই আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠেছে। এর উপর ভবিষ্যতের ভাবনা আর জোটাতে চাই না।

সাগরিকা বিস্মিত হয়ে বললে—এ আপনি কী বলছেন ? এত সুখ,

এত সমৃদ্ধির ভেতরও আপনি অসুখী ?

—না, মা। অসুখী নই। এ যুগের প্রাচুর্য, আর সাফল্যের আলো-ঝলমল ঔজ্জ্বল্য দেখে দেখে, প্রাণটা কেমন যেন শুকিয়ে উঠেছে। তাই ইচ্ছে হচ্চে, একটা অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত, অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে, তার অতল তলে তলিয়ে যাই। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে ঝল্‌সানো স্নায়ুগুলোকে একটু বিশ্রাম দিই।

—আপনি কি এই সুখ শান্তি চান না ?

—চাই। কিন্তু অনবরত আরাম, আর সুখের সুড়সুড়ি খেয়ে খেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। একটা কিছু জ্বালা, একটা কোন যন্ত্রণার সোনালী আগুনে, সুখপঙ্গু শরীরটা একটু সেঁকে নেবার জন্যে প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

—বুঝেছি। সাগরিকা বললে ঃ লোকে বলে, এটা "সব পেয়েছির দেশ" তাই না ?

—হ্যাঁ মা। আমরা তো তাই গর্ব করে বলি।

—বলুন আপনারা যা খুশি। কিন্তু আমি বলছি, যে দেশে আশ্চর্য নেই, সে একটা মানুষের দেশই নয়।

—মা! আমাকে তোমাদের পৃথিবীতে নিয়ে যাবে ?

—পৃথিবীতে ? সত্যি যাবেন ? কিন্তু সেখানে যে……

—সেখানে তোমার বাবা আছেন। আমি শুধু একবারটি দেখতে চাই তাঁকে। যার জন্যে এতদূরে এসেও তোমার এত উদ্বেগ, এত করুণা ? সেই পৃথিবীর বাবা কেমন মানুষ আমি দেখবো।

—তা' তা বেশ তো। চলুন। কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ?

—অনুমতি কারও নিতে হবে না মা। আমিই তরভার রাষ্ট্রপতি। সেই মহান গণ-অভ্যুত্থানের সময়, আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সকলকে আমি হারিয়েছি। এ দেশটাকে সব পেয়েছির দেশ করে গড়ে তুলেছি; কিন্তু একটিও কন্যা আমি পাইনি। আমাকে "বাবা" বলে ডাকবার

কেউ নেই। আমার জন্য উদ্বেগে কারও তোমার মত দুটি সুন্দর চোখ মমতার অশ্রুতে ভরে ওঠে না। মা! সব পেয়েছির দেশের সর্বাধিনায়ক আমি সর্বহারা! বলো মা, আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? যেখানে স্বার্থের কথা তুলে, ভবিষ্যতের কথা তুলে, মানুষ মানুষকে ভালবাসে ; এই সব পেয়েছির দেশ ছেড়ে, আমি সেই পৃথিবীতে যেতে চাই। যাবে মা, আমায় নিয়ে যাবে?

সহসা আকুভের অপত্যস্নেহে আপ্লুত হয়ে, সাগরিকা গভীর মমতামাখাসুরে বললে—বাবা! এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার কন্যা হলাম। আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

সমরেশ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে—হ্যাঁ। পৃথিবীতে আপনার মত মানুষেরই এখন খুব প্রয়োজন। "দুনিয়ার মানুষ, এক হও।"—এই শ্লোগান, এই বাণী শুধু আপনিই দিতে পারবেন। চলুন! হয়তো আপনার প্রেরণাতেই পৃথিবীতে একরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে। তরভার আকাশে তখন সাতটি পূর্ণচন্দ্র জেগে উঠেছে। ছোট্ট সোনালী সসারটা সবুজ গ্রহটি থেকে ধীরে ধীরে খানিকটা উপরে উঠেই হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকের মত তীব্রগতিতে মহাশূন্যের মধ্যে ছুটে চলল।

অন্তহীন শূন্যতার ভেতর জন্ম নিল একটি সোনালী আশ্বাস।

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্যের

ভালো ভালো উপন্যাস

ঢেউভাঙ্গা মুক্তা ৬.৭৫

'শেষ পর্যন্ত কৌতূহল'—আনন্দবাজার পত্রিকা

রোমাঞ্চকর নতুন পৃথিবী ১.৭৫

সম্পূর্ণ সায়ান্স ফিকশন উপন্যাস

অ্যাল্‌ফা-বিটা ॥ ৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা : ৪

["নাড়ুদার বিচিত্র কাহিনী"—১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

—"ধূমকেতু নিয়ে সমস্যা কেন?" আমার প্রশ্নের উত্তরে নাড়ুদা জানালেন,

—১৯৬৫ সালে আকাশে দেখা গিয়েছিল এই ধূমকেতুটিকে, নাম ইকেয়াসেকি। সেবারে তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই এবারে আবার এসেছে। বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করে দেখেছেন এবারে এই ধূমকেতুটির সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ অনিবার্য।

কমপুটার যন্ত্রে হিসাব নিকাশ করে খবর এলো আর মাত্র বারমিনিট সময় আছে। বার মিনিট পরই ধূমকেতুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমানায় ঢুকে পড়বে। পৃথিবীকে অভয়বাণী পাঠালাম। কোন ভয় নেই, আমি পৃথিবীকে বাঁচাবোই; তার ফলে যদি নিজের জীবনও যায় তবে যাক্,—বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর।...

...আর মাত্র দু মিনিট। ভাসল রজার ২০৩। তারপর আমার রকেটে যতগুলো রেট্রো রকেট ছিল। সবগুলোতে একটা করে পারমাণবিক বোমা ফিট্ করে ধূমকেতুটির দিকে ছুঁড়ে মারলাম। একটার পর একটা বিস্ফোরণ হ'ল ধূমকেতুর গায়ে। এক মিনিটেই কাজ হ'ল। ওর গতিমুখ একটু সরে গেল। পৃথিবী রক্ষা পেয়ে গেল সে যাত্রায়।

কিন্তু এদিকে আমার অবস্থা সঙ্গীন, রজার ২০৩এর নিজের গতিবেগ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ তো আছেই তার উপর রেট্রো রকেটের ধাক্কা। ফলে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর কমপুটারের হিসাব নির্ভুল ছিল, তাই ঠিকমতো পৃথিবীর দিকে এগিয়ে গেলাম, একটু এদিক সেদিক হ'লে সারাজীবনের মতো পৃথিবী ছাড়িয়ে অসীম মহাকাশের কোথায় গিয়ে পড়তাম; চিন্তা করতেও ভয় লাগে।

উল্কার মতো নেমে এলাম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে। রকেট বাতাসের ঘর্ষণে লাল হয়ে উঠল, ভেতরে আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবে মহাকাশচারী হবার আগে আমার শরীরকে এর চাইতেও

অনেক বেশী উত্তাপ সহ্য করতে হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রকেট নামল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। রকেট সহ প্রচণ্ড গতিতে ডুব দিলাম সাগরের জলে, ডুবছি তো ডুবছিই। এ চলার বুঝি আর শেষ নেই।

হিসাব করে দেখলাম প্রায় ছত্রিশ হাজার ফুট নীচে নেমে এসেছি। রকেটটা সত্যি মজবুত! এত ঝড় ঝাপটার পরও কিস্যু হয়নি!

আরো প্রায় শ'দেড়েক ফুট ডুববার পর মাটির নাগাল পেলাম। এরপর আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগলাম, আরও একটা অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশটাও বেড়ানো হল। ওটা দেখবার ইচ্ছে ছিল।··· ···

··· ··· এর পরদিনই কাগজে বড় বড় হরফে আমার নাম বেরোল, কত বই লেখা হল আমার নামে—

ডঃ নারায়ণ ভট্টাচার্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা! পৃথিবীকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার কাহিনী। ইকেয়াসেকিতে নারায়ণ ভট্টাচার্য! প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর তলদেশে ভ্রমণের গল্প। বৃহস্পতি বিজয়ী নারায়ণ ভট্টাচার্য! ইত্যাদি—

"সবই না হয় বুঝলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটাই তো চাপা পড়ে গেল।" আমি বললাম।

—"আসল? সেটা আবার কোনটা?"

"—ঐ বৃহস্পতির রহস্যটা?"

—"ও, কিন্তু তা'তে আমার সত্যিকারের কোনও কৃতিত্ব নেই। ওটা আমার ইন্‌ডাইরেক্ট বেনিফিট্ বলতে পারিস।

রকেটের গায়ে পজিটিভ্ বিদ্যুৎ পেয়ে সবটা ইলেক্‌ট্রন ডিস্‌চার্জ হয়ে যায়। যার ফলে বৃহস্পতি গ্রহ কলঙ্কমুক্ত হয়।"

নাড়ুদার কথা শেষ হতে না হতেই গৌতম বলে উঠল—"দেখি না নাড়ুদা আপনার হাতটা একবার। আপনার হাতে নিশ্চয় বৃহস্পতিস্থানে বৃত্তচিহ্ন আর নয়তো চন্দ্র স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন আছে!!"

সায়ান্স-ফিক্শ্যন সিনে ক্লাবের আগামী প্রদর্শনী

স্থান : অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস

তারিখ : ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭, রবিবার

সময় : বিকেল ৫টা এবং ৭টা

ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল ভের্ন

[ব্রাসেলস্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ (গ্র্যাণ্ড প্রিক্স) পুরস্কারপ্রাপ্ত]

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

আকাশে উড়ছে ফ্যানটাসটিক উড়ো-যন্ত্র! ডানা-মানুষ হাতের জোরে উড়ছে মেঘের ওপর! অবিশ্বাস্য সমুদ্র-যুদ্ধে লেক্‌ট্রনিক মেসিন! বিভীষিকা দ্বীপ থেকে জলের তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে পলায়ন! জলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার!

৫৬ বছর আগে মারা গেছেন জুল ভের্ন। কিন্তু আজও তিনি সায়ান্স-ফিকশ্যন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রে সমান জনপ্রিয়।

সারা জীবনে কম বই লেখেননি জুল ভের্ন। তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাসগুলি সিনেমায় রূপায়িত হবার পর সারা পৃথিবী ভের্ন-পাগল হয়ে উঠেছে। ভের্ন-য়ের বই যাঁরা পড়েননি, তাঁরাও ভের্ন পড়তে শুরু করেছেন ভের্নের ফিল্ম দেখার পর।

ভের্নের এই অসামান্য জনপ্রিয়তার সর্বাধুনিক নিদর্শন হল জোসেফ লেভিন্স প্রযোজিত পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র "ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল ভের্ন"।

ভের্নের জন্ম ১৮২৮ সালে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যত উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার প্রায় সব কটিতেই আছে কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক উপাদান। একাধারে সায়ান্স-ফিকশ্যন, রোমাঞ্চ ও রোমান্স তাঁর ছবিতে থাকে বলেই সিনেমা-রসিকদের কাছে তিনি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ভর্নের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল আইনবিদ হিসেবে। তারপরেই শুরু করলেন নাটক আর অপেরা লেখা। ১৮৬২ সালে লিখলেন সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন উপন্যাস "ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন"। তখনকার দিনে বইটার কাটতি দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছিল!

তারপর থেকে পঞ্চাশটিরও বেশী সায়ান্স-ফিকশ্যন লিখেছেন ভর্ন। সে সব উপন্যাসের মধ্যে আছে "সমুদ্রের নীচে তেতাল্লিশ হাজার মাইল", "পৃথিবী থেকে চাঁদে", ('আশ্চর্য'তে প্রকাশিত) "আশ্চর্য দ্বীপ" আর "ভাসমান নগরী"। মাছের মত সাবমেরিন, বেলুনের মত যুদ্ধের-এরোপ্লেন, ভয়ানক বিস্ফোরক ভর্তি ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি—বিস্ময়কর ভাবীকালের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেসব উপন্যাসে তখনকার মানুষ এসব আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা ভাবতেই পারত না।

ভর্নের আশ্চর্য দূরদৃষ্টি যে বহুক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ হল চাঁদে যাওয়ার সময়ে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি। ভর্নের হিরো অবশ্য চাঁদে গেছে কামানের গোলায় চেপে ('আশ্চর্য' মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৬৪) অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত সম্পূর্ণ উপন্যাস)। কিন্তু গোলাটা ছুঁড়েছেন মহাশূন্যের সেই অংশে যে অংশে চাঁদ নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছোবে যথাসময়ে। আধুনিকযুগে চাঁদে যন্ত্রযান পাঠানোর সময়ে ঠিক এই থিওরী রুশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনুসরণ করেছেন।

ভর্নের গোটা বারো উপন্যাসের চমক লাগানো অংশগুলো নিয়েই তোলা হয়েছে "ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অফ জুল ভর্ন"। ভর্নের কল্পনা জীবন্ত হয়েছে। তাছাড়া একটা নতুন ধরনের পদ্ধতি (মিসটিমেশন)র ফলে দর্শক সাধারণের মনে হবে এ তো শুধু ছায়াছবি নয়, এ তো সত্য, আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। ভর্নের স্বপ্নকে এভাবে পর্দায় এর আগে কেউ রূপায়িত করতে পারেন নি।

চলচ্চিত্রকে প্রাণবন্ত করার জন্যে আজ পর্যন্ত যতরকম পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, 'মিসটিমেশন' তাদের মধ্যে সবচাইতে চমকপ্রদ, সবচাইতে আধুনিক, সবচাইতে শ্বাসরোধী। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক চেকোশ্লোভাকিয়ান পরিচালক ক্যারেল জেমান। ভর্নের সায়ান্স ফিকশ্যন সিনেমায় তুলে জগৎজোড়া নাম কিনেছেন তিনি। বর্তমান ছবিরও ডিরেক্টর ইনি।

সত্যিকারের আলোকচিত্রের সঙ্গে কার্টুন আর পুতুল খেলার ফিল্ম কৌশল মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছে 'মিসটিমেশন' পদ্ধতি। সারা পৃথিবীর তাবৎ সিনেমা কারিগররা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, হ্যাঁ ক্যারেল জেমান একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন বটে। 'মিসটিমেশন' নিঃসন্দেহে অতীব মৌলিক এবং রীতিমত বিস্ময়কর এক পদ্ধতি। দর্শকের চোখের সামনে দিয়ে পাখনাওলা ডুবোজাহাজ আর অতিকায় বেলুন দিব্বি সাগর আর আকাশ চিরে ধেয়ে গেছে সত্যিকারের যন্ত্রযানের মত।

নতুন এই টেকনিক ব্র্যাশেলস্ ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে গ্র্যাণ্ড প্রিক্স অর্জন করতে সাহায্য করেছে বর্তমান ছবিকে। নিউইয়র্ক টাইমসের জনৈক সমালোচক তো বলেইছেন—"বহু বছরে এরকম মৌলিক ছবি আর দেখা যায়নি।"

মিষ্টিমেশনের উদ্ভাবন কিন্তু কেবল এই "ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল ভর্ন"এর জন্যে।

৭৫ বছর কি তারও আগে ভর্নয়ের মূল গ্রন্থে যে সব লিথোগ্রাফ ছিল, সেইগুলির ভিত্তিতেই ফটো তুলেছেন সিনেমা শিল্পের জাদুকর ক্যারেল জেমান। সেই কারণেই ৭৫ বছর আগে ভর্নের কল্পনায় যা ধরা পড়েছিল, তাই রঙে রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে পর্দায়। ১৯০৫ সালে মারা গেলেও আধুনিক যুগের মহাকাশপোত, পারমাণবিক বোমা, ক্ষেপণাস্ত্রর ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন অমর গ্রন্থে।

১৯০০ সালে ভর্ন তখনও জীবিত। তাঁর সর্বপ্রথম রূপোলী

গর্দায় ফুটিয়ে তোলা হল তাঁর একটি উপন্যাস "এ টি প টু দি মুন"। সে ছবি ভর্ন দেখেছিলেন। তারপর থেকে তোলা হয়েছে কুড়িটিরও বেশী ছবি ভর্ন অবলম্বনে। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হল এই "ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল ভর্ন"।

এ ছবিতে চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলীর মধ্যে আছে ডানা নেড়ে উড়ন্ত মানুষের অ্যাডভেঞ্চার আর পঞ্চাশ ফুট লম্বা কামান, সমুদ্রের তলদেশে ভয়ানক সাবমেরিণ যুদ্ধ আর অদ্ভুত ডিজাইনের মোটর সাইকেল যা ছুটছে সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে। উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ মিশোনো এ ছবির সমকক্ষ দ্বিতীয় ছবি এখনো ওঠেনি।

—গল্প—

সমুদ্রের ধারে নিরালা একটা বাড়ী। প্রফেসর রোস আর তাঁর সহকারী সাইমন হার্ট থাকেন এই বাড়ীতে। দুজনেই দিনরাত খেটে সাধনা করছেন। সে সাধনা মারাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরক আবিষ্কারের।

বিস্ফোরকটা আবিষ্কার করা হয়ে গেলেও কিছু খুঁটিনাটি তখনও বাকী। তাই নিয়ে ব্যস্ত দুই বৈজ্ঞানিক। এমন সময়ে একদল বোম্বেটে বাড়ীতে হানা দিয়ে দুজনকে বন্দী করে নিয়ে গেল বন্দীদের তোলা হল পালতোলা এক জাহাজে। জাহাজের মালিক, পালের গোদা আর্টিগাসের সঙ্গে আলাপ হল প্রফেসরের।

আর্টিগাস প্রফেসরকে বুঝোলো, তার ইচ্ছা সাধু, উদ্দেশ্য মহৎ। সে চায় প্রফেসরকে সাহায্য করতে—যাতে এই শক্তিশালী বিস্ফোরক অসৎ লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে। এদিকে হার্টকে আটক রাখা হয়েছে বোম্বেটেদের ডুবোজাহাজে। পালতোলা জাহাজের পেছন পেছন আসছে ডুবোজাহাজ। আর্টিগাসকে তার বিশ্বাস নেই। এমনি সময়ে ডুবোজাহাজের ছুঁচোলো ডগার এক ধাক্কায় ফুটো হয়ে গেল একটা সওদাগরী জাহাজ। বোম্বেটেরা জাহাজ লুঠ করে নিল। আর ধরে নিয়ে এল সুন্দরী তরুণী জেনকে।

ঘাঁটিতে পৌঁছোয় বোম্বেটেরা। আটলান্টিক সমুদ্রের মাঝে এক আগ্নেয়-দ্বীপে তাদের ঘাঁটি। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। সমুদ্রের তলায় জলভরা এক সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ দ্বীপের তলা ভেদ করে পৌঁচেছে ঘাঁটিতে। বোম্বেটেদের ডুবোজাহাজ চেপে ঘাঁটিতে পৌঁছালো বন্দীরা। প্রফেসর আর জেনকে নিয়ে যাওয়া হল আর্টিগাসের প্রাসাদে। প্রফেসরের মনে তখনো কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আর্টিগাস তাঁকে ল্যাবোরেটরী দিলে কাজ করবার জন্যে। সাংঘাতিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী শেষ করে আনার কাজে দিনরাত খাটতে লাগলেন প্রফেসর। হার্টকে কিন্তু আটকে রাখা হলো পৃথক একটা কুঁড়ে ঘরে। বোম্বেটেদের মতলব যে সুবিধের নয়, প্রফেসরকে সে বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল হার্ট—কিন্তু ব্যর্থ হল। শেষকালে, সব খবর একটা কাগজে লিখে বেলুন ছেড়ে দিল হার্ট। বাইরের দুনিয়ায় কারো হাতে গিয়ে পড়লেই জব্দ হবে বোম্বেটেরা।

তারপর, অন্য ফন্দী আঁটে হার্ট। জলমধ্যস্থ সুড়ঙ্গের মেঝেতে একটা তার সারাচ্ছিল একজন বোম্বেটে মিস্ত্রী। স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে কাজ করতে থাকে হার্ট। সেখান থেকেই পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা দানব অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে সাগরের নীচে।

এদিকে, বেলুনবাহিত হার্টের খবর পৌঁচেছে লোকালয়ে। একটা ফরাসী ডুবোজাহাজ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে এবং হার্টকে উদ্ধার করে। কিন্তু কপাল মন্দ। প্রফেসরকে উদ্ধার করার আগেই বোম্বেটেদের খুনে ডুবোজাহাজের ধাক্কায় তলিয়ে যায় ফরাসী ডুবোজাহাজ। হার্ট কোনরকমে বেঁচে যায়। ফিরে আসে প্রাসাদে।

ইতিমধ্যে প্রফেসর রোস প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী শেষ করলেন। বড় বড় কয়েকটা রণতরী দ্বীপকে ঘিরে ফেলেছিল, দস্যুদের গুঁড়িয়ে মারার জন্যে তারা কামান ছুঁড়তে শুরু করল। বোম্বেটেরা

তখন স্থির করলে, প্রফেসরের বানানো ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেবে আক্রমণকারী রণপোতগুলো। কিন্তু ছোঁড়ার ঠিক আগে চৈতন্যোদয় হল প্রফেসরের। বুঝলেন বোম্বেটেদের কুমতলব। আর সময় ছিল না। নিজের আবিষ্কার নিজের হাতে ধ্বংস না করলে সারা পৃথিবীর সর্বনাশ। দোলনা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছেড়ে দিলেন প্রফেসর—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেল গোটা দ্বীপটা। বেঁচে রইল শুধু সাইমন হার্ট আর জেন। একটা বিশাল বেলুনে চেপে তারা উঠে পড়ল আকাশে।

জুল ভর্নের "ফর দি ফ্ল্যাগ" নামে শ্বাসরোধী উপন্যাস অবলম্বনে তোলা হয়েছে আশ্চর্য এই ছবি। উপন্যাসটির অনুবাদ 'আশ্চর্য!'তে খুব শিগ্রী থেকে ছাপা হচ্ছে। উপন্যাসটি লিখেছেন ফরাসী লেখক, ছবিটি তুলেছেন চেকোশ্লোভাকের চিত্র পরিচালক এবং পরিবেশন করছেন আমেরিকান ডিষ্ট্রিবিউটর। এই থেকেই জুল ভর্নের বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা হৃদয়ঙ্গম করা চলে।

বাংলায় অভিনব রোমাঞ্চকর
পকেট বই !! ২৫০ পৃষ্ঠা !!
মঙ্গলগ্রহের পৃথিবী আক্রমণ

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ (উপন্যাস)

মনোরঞ্জন দে

দাম ৮০ পয়সা মাত্র (ডাক খরচ ৮ পয়সা; রেজিস্টার্ড ডাক খরচ ৬৩ প.)
ভিপিতে বই পাঠানো হয় না।

অ্যাল্‌ফা-বিটা ॥ ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন ॥ কলিকাতা ১৪

হ্যাম

রণেন ঘোষ

১৯৬০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। গভীর রাতে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল মরোক্কোর আগাদির শহর। ১২,০০০ লোক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল, গৃহহীন হল ৩৫,০০০। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে লয়েউটে বন্দরের আমেরিকান নৌবাহিনীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় কি? মরোক্কো সরকার তখন এমেচার (HAM) বিল রাইটকে স্মরণ করলেন। আগাদির একটু দূরে বাস করতেন মিঃ রাইট। ওর বাড়ীতে এক ওয়ারলেস ষ্টেশন (No. CN8GJ) ছিল। কিন্তু লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ষ্টেশন স্থানান্তরিত করা বেআইনী। তাই 'হ্যাম' বিল রাইটকে ইতস্ততঃ করতে দেখে মরোক্কোর যুবরাজ বললেন—ঠিক আছে, এর জন্য আপনার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হলে আমার লাইসেন্সে কাজ চালাবেন। ব্যাস, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আগাদির শহরে হাজির হলেন 'হ্যাম' রাইট। বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হল এবং জরুরী সাহায্যের আবেদনও ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। তারপর পুরো ১৬ ঘণ্টা ধরে এই একটি মাত্র যোগাযোগ ছিল আগাদির সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর। এর কয়েকদিন বাদে 'হ্যাম' বিল হেস নামে B.B.C.-র এক কর্মচারীর নিজের তৈরী রেডিওতে ১৫ মিটার ব্যাণ্ডে এক জরুরী সাহায্যের আবেদন ধরা পড়ল। আবেদন আসছে মরোক্কোর এক ষ্টেশন থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত আগাদির দুর্গতদের জন্য প্রচুর পরিমাণে মেভোফেড্ (Mevophed) প্রয়োজন। সঙ্গে

সঙ্গে 'হ্যাম' স্থানীয় থানায় সংবাদ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ওষুধ পৌঁছল আগাদির শহরে। বাঁচল কতকগুলো আহত পীড়িত মানুষ।

কিন্তু কারা এই হ্যাম? কি এদের কাজ? আমাদের দেশেও কি আছেন এরা?

রেডিও আবিষ্কারের শুভ মুহূর্তে সূচনা হয়েছে এ্যামেচারের। এ্যামেচারের এ্যাম থেকেই কালক্রমে হ্যামের জন্ম। হ্যাম কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। এ্যামেচার রেডিওর হবি যাদের আছে আছে তারাই হ্যাম নামে পরিচিত। অন্যান্য হবির মত এই হবির উদ্দেশ্যও নির্মল আনন্দ এবং জ্ঞানচর্চা। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে এই হবির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। রেডিও টেকনোলজির ক্ষেত্রে হ্যামদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানর জন্য স্ব স্ব রাষ্ট্র বা দেশের আইনানুমোদিত স্বীকৃতি আবশ্যক।

রেডিও এ্যামেচারের জন্ম আমেরিকায়। ১৯৪৪ সালে হিরাম পারসি ম্যাক্সিম নামে এক ভদ্রলোকের চেষ্টায় আমেরিকান রেডিও রীলে লীগের (A. R. R. L.) জন্ম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু হলেও ১৯১৯ সালে পুনর্গঠিত হয় এই ক্লাব। তখন এর সভ্য সংখ্যা ৬ হাজার। এর পর ২২টা দেশের প্রতিনিধিরা প্যারিসে মিলিত হয়ে International Amateur Radio Union-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতবর্ষেও সুদূর ১৯১৯ সালে দুজন হ্যাম সর্বপ্রথম লাইসেন্স পান। ১৯২৯ সালে গড়ে ওঠে ইণ্ডিয়ান রেডিও সোসাইটি। তারপর ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রদেশের মো (Mhow) শহরে এবং কলকাতায় ১৯৪৯ সালে এ্যামেচার রেডিও ক্লাব গড়ে ওঠে। এর ঠিক দশ বছর পরে ১৯৫৯ সালে এ্যামেচার রেডিও সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয় দিল্লীতে। বর্তমানে বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলিকাতা এই তিন জোনে বিভক্ত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র। যে কোন ভারতীয় এই সোসাইটির সভ্য হতে পারেন।

অপারেটিং লাইসেন্স দেন ভারত সরকারের ওয়্যারলেস এ্যাডভাইজার। তবে অনেক বিষয়ের মতো ভারতও এ বিষয়ে বেশ পিছিয়ে আছে। বর্তমান আমেরিকায় হ্যামদের সংখ্যা যখন ৩,০০,০০০ উপরে তখন ভারতের সভ্য সংখ্যা মাত্র ৪০০ কিছু বেশী।

বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মন অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। তাই মহাকাশেও হাত বাড়িয়েছেন হ্যামরা। ১০ই মার্চ ১৯৬৫ সালের গ্রীণিচ সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ OSCAR III (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio III) নামে এক উপগ্রহকে পাঠান হয় মহাকাশে। সম্পূর্ণ এ্যামেচারদের তৈরী এই উপগ্রহ অবশ্য এর আগেও OSCAR I এবং II কেও মহাকাশে পাঠান হয়েছিল। উদ্দেশ্য—উপগ্রহ মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান করা। বর্তমানে আরও জটিল ও উন্নত ধরনের উপগ্রহ OSCAR IV সমাপ্তির পথে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রহ-গ্রহান্তরেও হ্যামদের পদধ্বনি শোনা যাবে।

ভূমিকম্প, যুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি মানব সভ্যতা ধ্বংসী বিপদে, রাষ্ট্র বা সমাজের প্রয়োজনে হ্যামরা এক গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় এই হবি। বিশ্বনাগরিক হ্যাম। অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষাই হ্যামের পাথেয়। আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনে হ্যাম অদ্বিতীয়।

যাঁদের এ্যামেচার রেডিও ট্রান্সমিশনের হবি আছে, তাঁরা 'হ্যাম' লাইসেন্স পেতে হলে নিচের ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন: ওয়্যারলেস অ্যাডভাইজার, ভারত সরকার, এ্যামেচার রেডিও সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, নিউদিল্লী।

———

পড়লেও চলে, না পড়লেও চলে, এমন পত্রিকা নয়……

আশ্চর্য !

মডার্ন সাহিত্যের এমন একখানি প্রেসটিজ ম্যাগাজিন যা না পড়লে সর্বাধুনিক কালচার এবং সামনের যুগের বিস্ময়কর বিবর্তনের ধারণা থেকে আপনি কম-সে-কম বিশ বছর পিছিয়ে থাকবেন ! প্রতি সংখ্যায় থাকে চমকপ্রদ উপন্যাস আর অবাক-লাগানো গল্পকল্পের রাশি। আর থাকে একটি বিশেষ বিস্ময়কর ছায়াছবির জগতে প্রবেশের অধিকার…অভূতপূর্ব একটি সিনে ক্লাবের সদস্য হয়ে যেতেও পারেন, যার সভাপতি সত্যজিৎ রায় ('আশ্চর্য !' পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ইনি)। সগৌরবে পঞ্চম বর্ষ চলছে !

বারোটি	সংখ্যার	চাঁদা	১৮ টাকা
চব্বিশটি	,,	,,	২৭ টাকা (২৫% বাঁচে)
ছত্রিশটি	,,	,,	৩৮ টাকা (৩০% বাঁচে)
ষাটটি	,,	,,	৫৪ টাকা (৪০% বাঁচে)

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্

ভারতে মনোরম গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্থা

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪। ফোন : ৩৪-৭২৭৪

গত ১৫ই জানুয়ারী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্যারাডাইস সিনেমায় ক্লাবের বর্ষশুরু প্রদর্শনী হিসেবে দেখানো হল জুল ভর্নের "ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন"-এর চলচ্চিত্ররূপ। শো শুরু হয়েছে সঠিক পৌনে ন'টায়। 'আশ্চর্য!' জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত 'হপ্তা পাঁচেক বেলুন চেপে' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা ছবিটির কাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর অনেক অমিল লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও ফিল্মটি সবাই উপভোগ করেছেন। রমা ঘোষ (১২৮৩) লিখেছেন:

নতুন সদস্য হ'য়ে এই প্রথম 'শো' দেখার সুযোগ ঘটলো ১৫ই জানুয়ারীর "ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন।" দেখে খুব আনন্দ পেলাম। খুব ভালো লেগেছিলো এই বইএর গানটি। এখনো এর সুরের রেশটুকু যেন কানে লেগে আছে। হয়ত অনেকদিন থাকবেও।

আরও ভালো লেগেছিলো ঐদিনের শান্ত পরিবেশ। কোনো সংগঠনের পরিচালিত কোনো অনুষ্ঠানে এই ধরনের শান্ত পরিবেশ অনেক দিন পরে চোখে পড়লো। কিছু সংখ্যক সদস্যের দেরীতে আসার জন্য একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিলো। যাঁরা দেরীতে আসেন তাঁদের সহায়তার জন্যে কিছু সদস্যের ভালো করে শো দেখা হয়ে ওঠে না। আশা করি সঠিক সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে সকলে পরস্পরকে সাহায্য করবেন।—রমা ঘোষ, সদস্য নম্বর—১২৮৩

কবি তারক মিত্রও লিখেছেন, ছবির গানটি তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী আরতি মুখার্জীর বাড়ী থেকে সবাই এসেছিলেন। তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন, এরকম সংগীতময় মনোরম ছবি তাঁরা দীর্ঘদিনের মধ্যে দেখেননি। বিশেষ করে আফ্রিকার হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ওপর দিয়ে বিশাল কিন্তু ভারী সুন্দর বেলুনের হেলেদুলে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যগুলি সত্যই অপূর্ব। ফুটবলের জাদুকর পি কে ব্যানার্জীও ছবি দেখে মুগ্ধ।

* * *

ক্লাবের আগামী ছবি হচ্ছে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭। স্থান: অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টস। সময়: বিকেল ৫টা এবং ৭টা। ছবির নাম "ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অভ জুল ভর্ণ"। বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। সুবৃহৎ কাহিনীটি অদ্রীশ বর্ধন কর্তৃক অনূদিত হয়ে শীগগিরই প্রকাশিত হবে 'আশ্চর্য!'র পাতায়।

* * *

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় বোম্বাই গেছিলেন ক্লাবের জন্য ছুটি বিশ্ববিখ্যাত ছবির ব্যবস্থা করতে। প্রথমটি বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে পুরস্কৃত "অ্যালফাভিল"। প্রিন্ট বোম্বাইতে এসে গেছে। দ্বিতীয়টি "ফারেনহাইট ৪৫১"। এটিও বোম্বাইতে এসে গেছে এবং কথাবার্তা চলছে সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে। "অ্যালফাভিল" সম্পর্কে এস্ এফ সিনে ক্লাবের পক্ষে কথাবার্তা চালাচ্ছেন বোম্বাইয়ের 'আনন্দম্' ফিল্ম সোসাইটি।

*　　　*　　　*

১৯শে মার্চ প্রাচী সিনেমায় দেখানো হবে জুল ভের্ণের "জার্নি টু দি সেণ্টার অভ দি আর্থ।" রঙীন সিনেমাস্কোপ ছবি—পাক্কা দুঘণ্টা লম্বা!

*　　　*　　　*

সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবির তৈরীর জন্যে প্রেসিডেণ্ট সত্যজিৎ রায় আবার বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এখনো তিনি চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছোননি।

*　　　*　　　*

যাঁরা এখনো সদস্য তালিকাভুক্ত হয়ে থাকতে চান, যথাবিহিতভাবে তাঁরা আবেদন করে রাখতে পারেন। সন্ধ্যে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ক্লাবে এলেই ফর্ম পাওয়া যাবে।

*　　　*　　　*

নতুন এবং বিখ্যাত পুরোনো সায়-ফি ছবির জন্যে বিশ্বের সর্বত্র চিঠি পাঠাচ্ছেন ক্লাব প্রেসিডেণ্ট সত্যজিৎ রায়।

*　　　*　　　*

"ফ্যানটাসটিক ভয়েজ" একটি অনবদ্য সায়-ফি ফিল্ম। মানুষের শিরা উপশিরার মধ্যে যাত্রা শুরু হয়েছে এক ক্ষুদে সাবমেরিনের উদ্দেশ্য: মগজের মধ্যে পৌঁছোনো। সেখানে রক্ত জমে গিয়ে এক বৈজ্ঞানিক মরতে বসেছেন॥ অস্ত্রোপচারেও কিছু হচ্ছে না। তাই ক্ষুদে সাবমেরিন গিয়ে তাঁকে নিরাময় করতে। বৈজ্ঞানিক কল্পনা যে কি বিস্ময়কর হতে পারে এবং তার চিত্ররূপ যে কতখানি চমকপ্রদ হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ছবিটি ক্লাবে দেখানোর জন্যে চেষ্টা চলছে। বিস্তারিত সচিত্র কাহিনীর জন্যে পরের সংখ্যায় দেখুন।

যাবেন শুধু তাঁদেরই নিয়ে যাবো আমরা। আগে জোর করে যাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ফিরে আসতে চান তাঁদের আমরা ফিরিয়ে দেব। যথাসময়ে আপনারা সবিশেষ জানতে পারবেন। এবার আজকের মতো সভার কাজ আমরা শেষ করতে চাই। তার আগে আরো দু' একটা কথা বলে আপনাদের কৌতূহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ করে দিই। রাশিয়ান বিজ্ঞানী-অভিযাত্রীদল যে ভয়ঙ্কর জানোয়ার দেখেছিলেন আপনারা অনেকে মস্কোর আকাশে সেইরকম জানোয়ারই দেখেছিলেন, অবিশ্যি সংখ্যায় বেশী। সেগুলি আসলে রক্তমাংসে গড়া কোন জানোয়ার নয়। উন্নত ধরনের থ্রি-ডাইমেন্সান্ প্রোজেকসানের কেরামতিতে তা দেখানো হয়েছে। মস্কোর আকাশে আলোর খেলা, জানোয়ারের গর্জন ইত্যাদি উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশলের সাহায্যে করা হয়েছিল। রাশিয়ান অভিযাত্রীরা আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটির কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন এবং তা' আমাদের মনঃপূত ছিলো না বলে আমরা ঐ রকম জানোয়ারের মূর্তি দেখিয়ে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেই পাথরের ঢিবির মধ্যে তাঁরা যা পেয়েছিলেন সে সবই আমাদের সাজানো। জানতাম জন্তুটার খোঁজে বেরোলে তাঁদের চোখে ঐ ঢিপিটা পড়বে এবং ভেতরের জিনিষগুলো তাঁরা পাবেন। আপনাদের রকেট 'মার্সিয়ান্ এক্সপ্লোরার' নেহাৎ একটা দুর্ঘটনার জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছল। উল্কাপাতের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমরা হার্মিসের চারিধারে মহাশূন্যে একলক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত একটি শক্তিশালী অ্যান্টিম্যাটার কণিকার বেল্ট তৈরী করে রেখেছিলাম। ঐ বেল্টের মধ্যে উল্কা এলেই তা বিস্ফোরিত হয়ে লোপ পেয়ে যায়। হার্মিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বেল্টের মধ্যে আপনাদের রকেটটি চলে গেছলো তাই তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হোল। আমরা তা' বাধা দিতে পারিনি এজন্যে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আজ সভার কাজ

তাহলে এখানেই শেষ করা যাক কি বলেন? আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করলাম। আপনাদের ধৈর্যের ওপরই অনেক উৎপীড়ন হোল এজন্যে ক্ষমা করবেন। আমি আজ যে সময়ে এসেছিলাম কাল ঠিক সেই সময়ে আমাদের দুজন মহিলা কর্মী এখানে আসবেন। আপনাদের পৃথিবী থেকে যাঁরা আমাদের গ্রহে যেতে চান তাঁদের কি ভাবে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হবে সেবিষয়ে তাঁরা আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বেশ এবার চলি। সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

এই বলে তিনি ডায়াস্ থেকে নামবার উপক্রম করতেই সেই ভারতীয় বাঙ্গালী সদস্য হঠাৎ আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাঁকে বাধা দিলেন। সদস্য বললেন, "মাফ করবেন আর একটা প্রশ্ন থেকে গেল স্যার! আমাদের রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা সেই পাথরের ঢিবির মধ্যে একটা কৌটোর ভেতর যে ছাইএর মতো জিনিষটা পেয়েছিলেন সেটা কি দয়া করে বলে যান।"

এই প্রশ্নে স্পষ্টই একটা বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে গেল ম্যাগমাসের মুখের ওপর। তিনি গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "আমি ভুলে গেছলাম এই কথাটা বলতে। জিনিষটা একটা মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি। আমাদের এক প্রিয় সহকর্মীর দেহের ভস্মাবশেষ ঐ ছাই। আপনাদের পৃথিবীতে এসেই একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছিলেন। আমাদের গ্রহের তুলনায় আপনাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কম। এই কথাটা তিনি ভুলে গিয়ে একটা খাদ পেরোতে গিয়ে অভ্যাস অনুযায়ী বেশী জোরে লাফ দিয়েছিলেন। তার ফলে খাদটা পেরিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনের বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে যে ছোট্ট পাহাড়টার ওপর খাদটা ছিল তার চুড়ো থেকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিটার নীচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়েছিলেন। শোচনীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এই দুর্ঘটনায়। আমাদের গ্রহের নিয়ম মতো তাঁর দেহ 'রে-গান্' দিয়ে ভস্মীভূত করে রেখে দিয়েছিলাম ঐ কৌটোর ভেতর। আমাদের প্রথম

শহীদের দেহভস্ম যা'তে পৃথিবীর বাসিন্দা। তাদের পায়ে সেই [illegible] ঐ ঢিবির মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম।"

[১১]

পরদিন যথাসময়ে রীনি আর জুলির শুভাগমন হোল রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন-গৃহে। তাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য, সপ্রতিভ অথচ নারীসুলভ মধুর আচরণ এবং আশ্চর্য বাক্-পটুতায় সকলে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁদের সামনে আবির্ভূতা হোল যেন স্বর্গের দুই মূর্তিমতী অ্যান্‌জেল!

সেদিন পৃথিবী থেকে রিগেলার (স্বেচ্ছা-যাত্রীদের 'স্বেচ্ছা-সেবক' যদি হয় তাহলে 'স্বেচ্ছা-যাত্রী' হতে বাধা আছে কি?) নিয়ে যাবার বিষয়ে যে বিশদ আলোচনা হোল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে অতি নিখুঁত সেই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি রাষ্ট্র সানন্দে সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তা'তে এরকম একটা ভালো ব্যবস্থায় কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। ভবিষ্যতে রিগেলা হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর একটা উপনিবেশ! সবদিক দিয়েই ব্যবস্থাটি সমর্থনযোগ্য সুতরাং অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে। শুধুমাত্র লালচীনের মহাপ্রভুরা সমস্ত ব্যাপারটিকে বুর্জোয়া পরিকল্পনা আখ্যা দিয়ে হাত গুটিয়ে রইলেন। তবে আমার মনে হয় এতে ভালোই হোল কারণ মাও-সে তুংএর জীবাণু রিগেলাতে চালান দিলে ভবিষ্যতে সেখানে চৈনিক-ব্যাধি হবার আশঙ্কা থাকতো! সেদিক দিয়ে বিচার করলে মহাপ্রভুরা আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবার পাত্র।

সারা পৃথিবীতে কয়েকটি রিক্রুটিং সেণ্টার খোলা হোল। সেখানে যাত্রীদের বাছাই কাজ চলতে লাগলো। যাকে-তাকে তো আর পাঠানো যায় না সুতরাং বেশ দেখেশুনে লোক নির্বাচিত হতে লাগলো!

সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরই (নরনারী) মনোনীত করা হতে থাকলো। রীনি ও জুলি জানিয়েছিলো আপাততঃ মাত্র দু' লক্ষ লোককে নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং সহজেই অনুমান করতে পারবেন কত নর-নারী হতাশ হয়েছিলেন। আমিও নাম লিখিয়েছিলাম এবং নির্বাচিত হবার জন্যে যে সব গুণ দরকার তার সবই আমার বেলায় মিলে গেছলো শুধু একটি বাদে—তা' হোল আমার স্বাস্থ্য; স্বাস্থ্যহীনতাও বলতে পারেন। অম্লরোগে ভুগি এজন্যে আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেল! তা না হলে বিজ্ঞানী অভিজিৎ সিংহের দেশের লোক এবং তারই মতো পদবীধারী বলে যাত্রীদের ফার্স্ট ব্যাচেই জায়গা পেতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছিঁড়লো না! তবে পরে বুঝতে পারলাম না যেতে পেয়ে বেঁচে গেছি। গেলে এই কাহিনী আপনাদের শোনাতে হোত না! আর ভণিতা না করে আসল কথায় যাওয়া যাক্ এবার।

প্রথম ব্যাচে যাবার জন্যে হাজার খানেক নর-নারী নির্বাচিত হলেন। তাঁদের নিয়ে যাবার জন্যে হার্মিসের প্রাথমিক ঘাঁটি থেকে একটা বিরাট বিমান এসে নামলো পৃথিবীতে। সেদিন রীনি ও জুলি জানিয়ে দিয়েছিলো যে প্রথম ব্যাচের লোকেদের প্রথমে হার্মিসে গিয়ে যাওয়া হবে। আপাততঃ হার্মিসে এতোবড় স্পেশ্‌শিপ একটাই আছে সুতরাং ঐ শিপটাই বর্তমানে কয়েকদিন পৃথিবী এবং হার্মিসের মধ্যে ফেরী করে যাত্রী নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি বড় শিপ এসে পৌঁছাবে রিগেলা থেকে। তারপর পাঁচ হাজারের ব্যাচ্ করে হার্মিস থেকে যাত্রীদের চালান দেওয়া হবে রিগেলাতে।

ম্যাগমাসের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞানী অভিজিতকে রিগেলার তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হোল হার্মিসের প্রাথমিক ঘাঁটি পর্যবেক্ষণ করে যাবার! শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, রিগেলাতেও স্বেচ্ছাযাত্রীরূপে

যাবার জন্যে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন ম্যাগমাস। 'রিগেলাতে যাওয়ার কথা পরে ভেবে যাবে আগে তো ওদের ঘাঁটিটা দেখে আসা যাক, এই ভেবে অভিজিৎ প্রথম ব্যাচেই চললো যাত্রীদের সঙ্গে।

সারা পৃথিবীর শুভকামনা নিয়ে রিগেলার বিরাট মহাকাশযান 'ভোমার-১৫' একহাজার যাত্রীকে নিয়ে মহাকাশ পাড়ি দিলো হার্মিসের অভিমুখে।

তারপর একদিন দুদিন করে একমাস কেটে গেল তবু হার্মিস থেকে আর কোন বিমান এলো না বাকী যাত্রীদের নিয়ে যেতে। সারা পৃথিবীর লোকের উৎকণ্ঠা বেড়ে চললো দিনের পর দিন। পৃথিবীর এতোগুলো মানুষ যে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো কি হোল তাদের ভাগ্যে কে জানে! ম্যাগমাস এবং তাঁর সহকর্মিনী রীনি ও জুলিকে দেখে সকলেরই মনে গভীর ধারণা হয়েছিলো যে কোন রকম প্রতারণার কাজ এদের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে? কি এমন অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটলো যার ফলে হার্মিস থেকে আর কোন বিমান এলো না বা কোন খবরও পাওয়া গেল না আর। সারা পৃথিবী মগ্ন হয়ে রইলো সীমাহীন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায়!

তারপর একমাস দুমাস করে একবছর কেটে গেল আর কোনও খবর এলোনা হার্মিস থেকে। কোন সমাধানই হোল না মহাকাশের এই অকল্পনীয় রহস্যের। পৃথিবীর মানুষের মনে এই দুশ্চিন্তা বিঁধে রইলো কাঁটার মতো।

* * *

তারপর একটি একটি করে তিরিশটি বছর বিলীন হয়ে গেল মহাকালের দুর্বার স্রোতে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর মানুষ মহাকাশ পরিক্রমায় অভাবনীয় উন্নতি করেছে। সৌর জগতের অনেকগুলি গ্রহে পদার্পণ হয়েছে মানুষের।

আই এস্ এ বা ইন্টারন্যাশনাল স্পেশ্ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশান্ অবশেষে একদিন ঠিক করলেন হার্মিসের রহস্যের সমাধান করবার

চেষ্টা করবেন। এক বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল যে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে একটা বিমানে করে হার্মিসে পাঠানো হবে। তাঁরা সেখানে পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন রহস্যের কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েকদিন পরে পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি স্পেশ্ শিপ যাত্রা করলো হার্মিসের অভিমুখে। 'ষ্টেলার ক্র্যাফ্ট-১০'—অভিযাত্রীদের জাহাজটির নাম—নিরাপদে অবতরণ কোরল হার্মিসের ওপর। বিজ্ঞানীরা দুর্বার কৌতূহল ও কিছুটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তা থেকে বেরিয়ে এলেন। জলবাতাস ও প্রাণের চিহ্ন বিহীন ঐ ক্ষুদ্র গ্রহটির ওপর তাঁরা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক গ্রহটির বুকে কোথায়ও কোন প্রাণী বা বস্তু কিছুই তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে এলো না। কেউ কোথায়ও নেই, খাঁ খাঁ করছে চারদিকে।

তাঁরা দিনের বেলায় অনুসন্ধান চালান আর রাত্রে আশ্রয় নেন তাঁদের ষ্টেলার-ক্র্যাফ্টের কেবিনের ভেতর। ঐ ক্ষুদ্র গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করতে মাত্র পাঁচ ছয় দিন লাগলো। কিছুই না পেয়ে অবশেষে তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করছেন এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একটা জিনিষ তাঁদের নজরে পড়লো। সাগ্রহে জিনিষটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁরা দেলেন যে সেটি একটি ক্ষুদ্র নোট বুক। কয়েক পাতা ইংরেজীতে লেখা আছে এবং শেষে নাম লেখা আছে অভিজিৎ সিংহ।

বিস্ময়ে ও কৌতূহলে অভিযাত্রীদের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হবার উপক্রম হোল। বিজ্ঞানী অভিজিত সিংহ কি লিখে গেছেন দেখা যাক্। সকলে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন নোট বইটার ওপর। মুক্তোর মতো ইংরেজী অক্ষরে লেখা আছে তিন চারটি পাতা মাত্র। তার বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় :—

"আমি যে শেষ চিঠি লিখে গেলাম আমার প্রিয় পৃথিবীর প্রিয়

মানুষদের প্রতি, জানি না তা কোনদিন তাঁদের হাতে পড়বে কিনা। তবু এই শেষ লিপি লিখে গেলাম আশায় ভর করে। হার্মিসে পৌঁছে দেখলাম রিগেলার মানুষদের ঘাঁটি এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। বিজ্ঞানকে চূড়ান্তভাবে আয়ত্ত না করলে একটা নিষ্প্রাণ মরুভূমির মতো গ্রহের বুকে সবরকম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ঘাঁটি বানানো সম্ভব নয়। এর বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ আর সময় নেই। কারণ এখনি আমাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতি সংক্ষেপে বলছি। এখানে যেদিন পৌঁছালাম তার পরদিনই দেখলাম কয়েকটি বিরাট স্পেশ্‌-শিপ এসে পৌঁছালো রিগেলা থেকে। অনেক নতুন লোক এলো। তারপর দেখলাম ওদের কি একটা গোপন বৈঠক হোল। আমার সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'লেও রীনির কাছ থেকে গোপনে জানতে পারলাম (মেয়েটা আমার দারুণভাবে ভালবেসেছিল) যে রিগেলার প্ল্যান্‌ বদলে গেছে। কি রকম বদলেছে তা' কিছুতেই বলতে চায় না অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ি করতে যা বললো তা'তে আমার হার্টফেল হবার উপক্রম! শুনলাম রিগেলার কর্তারা স্থির করেছেন পৃথিবীর যে সব মানুষদের এখানে আনা হবে তাদের রিগেলাতে নিয়ে যাওয়া হবে না। তাঁদের যৌনগ্রন্থি কেটে নিয়ে দেহ ভস্মীভূত করা হবে। ঐ সব গ্রন্থি থেকে বিশেষ ইজেক্‌সান্‌ তৈরী করে রিগেলার নরনারীদের ওপর প্রয়োগ করলে আবার নাকি রিগেলার সন্তান জন্ম আরম্ভ হবে! ম্যাগমাসের নেতৃত্বে হার্মিসে অভিযাত্রীদল আসবার পরে নাকি রিগেলার বিজ্ঞানীরা এই পন্থা আবিষ্কার করেছেন। ম্যাগমাস্‌ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে অসম্মতি জানানোতে তাঁকে হার্মিস থেকে রিগেলাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রীনি, জুলি এবং তাদের দলের আরো অনেকে ফিরে যাচ্ছে বা ফিরতে বাধ্য করা হয়েছে এই দানবিক হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবার অস্বীকৃতি জানানোর ফলে। যিনি নতুন নেতা এসেছেন তিনি নাকি মায়ামমতাহীন এক নিষ্ঠুর বিজ্ঞানী। আমাদের পৃথিবীকে দখল করবারও নাকি তাঁর মতলব আছে।

কি সাংঘাতিক! এ আমি কি শুনলাম? বিজ্ঞানে এতো উন্নত মানুষ এমন নিষ্ঠুর পরিকল্পনা করতে পারে! এ যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার! যাইহোক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমাকে বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে কোরবো তাই তো ভেবে পেলাম না! দিনরাত চিন্তা করতে লাগলাম পন্থা আবিষ্কার করতে। নতুন জাহাজগুলি আসবার দু'দিন পরে ম্যাগমাস্ ও রীনি জুলি ফিরে গেলেন রিগেলার অভিমুখে। বিদায় বেলায় রীনির সপ্রেম চাউনি ও অশ্রুসজল আঁখি আমার পর-জন্মের পাথেয় হয়ে রইলো। ঐ হত্যাকাণ্ডের থেকে আমার নাম বাদ ছিলো। নতুন নেতা আমাকে বাঁচবার এবং রিগেলাতে যাবার অধিকার দিয়ে ছিলেন। আমি অনায়াসেই রীনির সঙ্গে চলে যেতে পারতাম এবং তাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবারও কোন বাধা ছিলো না। তবু আমি গেলাম না কেন তার জবাব শেষে আছে। আমি রীনিকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। সে আমাকে না নিয়ে কিছুতেই যাবে না। আমি তাকে বোঝালাম সে যেন এখন চলে যায়। আমি পরে রিগেলায় গিয়ে তার সপ্রেম আলিঙ্গনে ধরা দেবো নিশ্চয়।

রীনিরা চলে গেলো। আমার জন্যে রেখে গেলো বুকভরা হাহাকার! যাই হোক, মনকে শক্ত করে আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম নিষ্ঠুর বিজ্ঞানীর প্ল্যান্ ব্যর্থ করে দেবার জন্যে। অবশেষে ভগবান আমার সহায় হলেন! একদিন বহুকৌশলে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বোম্ হাতিয়ে ফেললাম। এই বোমাটার বিস্ফোরণ ঘটালে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঘাঁটি সমেত। কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মনস্থির করে ফেললাম। অবিশ্যি পৃথিবীর নিরীহ অনেকগুলি নর-নারীকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে (এবং আমাকেও) কিন্তু আর তো কোন উপায় নেই। যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন তাঁদের কথা বলছি। সারা পৃথিবীকে ওই নিষ্ঠুর বিজ্ঞানীর কবল থেকে বাঁচাতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই।

ডায়েরীতে সব কিছু লিখে রেখে ঘাঁটি থেকে অনেকটা দূরে রেখে

এলাম, যদি কোনদিন আমার পৃথিবীর মানুষের হাতে পড়ে এই দুরাশায়।

তারপর!

হে, পৃথিবী বিদায়!"

ঐখানেই শেষ হয়েছে ডায়েরী!

* * * * * *

রাষ্ট্রসংঘের বিশাল অট্টালিকার সামনে স্থাপিত হোল বিজ্ঞানী অভিজিতের মর্মরমূর্ত্তি। সারা পৃথিবীর মানুষ সীমাহীন শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিতে স্মরণ করে এই তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানীকে যে অচিন্তনীয় উপায়ে নিজের জীবন দিয়ে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করে গেল এক সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে।

*

আশ্চর্য !

মার্চ ১৯৬৭ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ !

সত্যজিৎ রায়ের

প্রোফেসার শঙ্কু ও গোলক-রহস্য

(কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক পুরস্কৃত গ্রন্থ "প্রোফেসার শঙ্কু" থেকে পুনর্মুদ্রিত)

অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস

উন্মাদ বৈজ্ঞানিক

(জুন ভর্ন রচিত "ফর দি ফ্ল্যাগ" এর অনুবাদ। উপন্যাস অবলম্বনে তোলা ফিল্ম ব্রাসেলস ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্র্যাণ্ডপ্রিক্স বিজয়ী। ছবিটি এস্. এফ. সিনে ক্লাবে প্রদর্শিত হচ্ছে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী '৬৭)

রণেন ঘোষের উপন্যাস

ঘুম-ঘর

(ভাবীকালের বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর কাহিনী)

এ ছাড়াও

কয়েকটি এমন অদ্ভুত গল্প যা এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি

আপনি কি এস্ এফ সিনে ক্লাবের সদস্য ?

তাহলে ১৮৲ টাকার 'আশ্চর্য !' মাত্র ১২৲ টাকায় পাবেন।

কম দামে সুন্দর সুন্দর বই !

অবসরের আনন্দে বই সংগ্রহ সহজ হলো

'ভাল বই পড়তে চাই, কিনতে চাই, নতুন নতুন লেখকের বিচিত্রতর রচনার স্বাদ পেতে চাই—কিন্তু পাই কোথায়—বইএর যা দাম ! কিনতে ভারী ইচ্ছে হয়, কিন্তু হতাশ হই দাম শুনে !'

হাজার হাজার পাঠকপাঠিকার এই দুঃখ আর বেশিদিন থাকবে না··· আশাতীত কম দামে বাছাই করা ভাল ভাল নতুন নতুন বই এখন থেকে বাড়ীতে বসেই পেতে থাকবেন "নাইস্ বুক ক্লাব"-এর মাননীয় সদস্যেরা···আন্‌কোরা, সবেমাত্র প্যাকেট থেকে খোলা বই ! সদস্য হওয়ার জন্যে নামমাত্র ৮০ পয়সা রেজিসট্রেশন ফী দিয়ে শেষপৃষ্ঠার কুপনটি পূরণ করে পাঠালেই হলো। এত সহজ ! যে কোন সময়ে এক মাস আগে জানিয়ে সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়াও যায়, কোন বাধ্যবাধকতা নেই ! যতদিন সদস্য থাকবেন, "নাইস্ বুক ক্লাব" কর্তৃক সুনির্বাচিত বই পাবেন একেবারে সামান্য দামে। সেই সঙ্গে পাবেন সুরুচিসম্পন্ন অভিজাত পাঠকপাঠিকার উপযুক্ত তৃপ্তিকর সম্মান !

প্রতি মাসে একটি করে ভাল বই ! ছ'মাসের নির্বাচিত বইএর তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেখুন·········

এদেশে এমন সম্মানজনক সুযোগ এই প্রথম

ভাল বই পড়া আর পড়তে দেওয়ার আনন্দ

শুভ নববর্ষ ! মাসিক তালিকা

১৯৬৭

জানুয়ারীতে : গ্রেগরী মুখার্জীর পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
"নতশির উর্মি"
(বাজারে ৫, সদস্যদের জন্য মাত্র ৩.৫০)
'পড়তে পড়তে মনে হয় চলচ্চিত্র'—আনন্দবাজার পত্রিকা

ফেবরুয়ারীতে : কোনান ডয়ালের বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ বই
"শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন" (অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত)
বাজারে ১০, ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৭,

মার্চ মাসে : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত ১৪টি উপন্যাস একত্রে
"বঙ্কিম রচনাবলী"
বাজারে ১২.৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ১০,

এপ্রিলে : ডাঃ রাধাগোবিন্দ দাসের নতুন উপন্যাস
"তিন অঙ্গে এক অঙ্গ"
বাজারে ৫.৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৩.৫০

মে মাসে : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
"কান্না" (বাজারে ৬.৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫.২৫)
'একটি নূতন জগতের উদ্‌ঘাটন করে বিস্মিত করেছেন'
—আনন্দবাজার পত্রিকা

জুন মাসে : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন বই (সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ)
"পিতৃস্মৃতি" বাজারে ১৬, ; সদস্যদের জন্য মাত্র ১৩.৫০
ঠাকুর পরিবারের সচিত্র দুর্লভ স্মৃতিকথা সবেমাত্র বেরিয়েছে

এই ছ'মাসের মধ্যে যে-কোন দু'মাসের নির্বাচিত বই আপনি না নিয়ে তার বদলে পরপৃষ্ঠায় তালিকা থেকে অন্য বই বেছে নিতেও পারেন। সবই পাবেন আশাতীত কম দামে—এদেশে এমন মজার নিয়মে বই কেনা এই প্রথম !

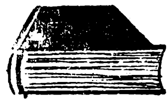

বদলী তালিকা

জগদীশপ্রসাদ দাসের নতুন উপন্যাস “হৃদয়ের স্বাক্ষর”

(বাজারে ৪৲ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৩৲)

আদিত্য ভট্টাচার্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস “ঢেউভাঙ্গা মুক্তা”

(বাজারে ৬·৭৫ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫৲)

কিঙ্কর অজিতকুমারের ধর্মগ্রন্থ “ওঙ্কার কথামৃত”

(বাজারে ৪৲ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ২·৫০)

সৈয়দ মুজতবা আলীর নতুন বই “বড়বাবু”

(বাজারে ৭·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৬৲)

স্বরাজ বন্দোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস “গোপী সংবাদ”

(বাজারে ৩·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ২·৭৫)

প্রবোধ সান্যালের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস “মনে রেখ”

(বাজারে ৬·৫০ ; সদস্যদের জন্য মাত্র ৫·৫০)

মনে রাখবেন, যে-মাসের জন্য যে-বই ক্লাব কর্তৃক উপরিলিখিত মাসিক তালিকা মত নির্বাচিত হয়েছে, সেই মাসে সেই বইখানিই পাঠানো হয়। মাসিক তালিকার আগু-পিছু করলে অসুবিধা হয়। সুতরাং মাসিক তালিকার কোনো বই পছন্দ না হলে যে কোনো দু'মাসের বইএর বদলে বদলী তালিকা থেকে অন্য বই বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে।

বুক ক্লাব প্রথা এদেশে নতুন, সেজন্য এর নিয়মকানুন বুঝতে কোনোরকম অসুবিধা হলে দয়া করে তৎক্ষণাৎ জানাবেন, আমরা সানন্দে মনোযোগ দেবো। চিঠিপত্রের সত্বর উত্তরের জন্য সর্বদা রিপ্লাই পোস্টকার্ড পাঠিয়ে সহযোগিতা করলে বাধিত হবো।

কেন আপনি 'নাইস্ বুক ক্লাব'-এর সদস্য হবেন ?

১। আপনি পাচ্ছেন মনোরম গ্রন্থ সম্ভার—প্রতিভাবান সম্ভাবনাময় জনপ্রিয় লেখকদের রচনা, পত্র-পত্রিকায় সুপ্রশংসিত, কোনটি-বা পুরস্কারপ্রাপ্ত !

২। বইগুলি দামী হলেও আশাতীত কম দামে ঘরে বসে আন্‌কোরা পাচ্ছেন !

৩। দোকানে গিয়ে সময় নষ্ট করে বই বাছাই করতে হচ্ছে না, কারণ 'নাইস্ বুক ক্লাব' পরিবেশিত প্রতিটি বই-ই বিশেষভাবে বাছাই করা !

৪। ভাল ভাল নির্বাচিত লেখকদের বই নিয়মিত কিনে নব্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার গৌরব অর্জন করছেন এবং রুচিসম্পন্ন পাঠকপাঠিকার সম্মানজনক তালিকায় আপনার নাম থাকছে !

৫। অল্প খরচে একটি মনোরম গ্রন্থাগার আপনার ঘরেই গড়ে তুলতে পারছেন !

৬। বই কিনলে আয়কর অব্যাহতি পাওয়া যায়, আপনি সেই সুযোগ নিশ্চিতভাবে পাচ্ছেন !

৭। ক্লাব কর্তৃক নির্বাচিত বইএর সঙ্গে বাজারের অন্যান্য পছন্দমতো বইও টাকায় ১০ পয়সা কম দামে কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ক্লাবের মাধ্যমে !

৮। 'বই ব্যাপার' নামে বই-সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্রিকা বিনামূল্যে পেতে থাকবেন। এতে ক্লাবের আগামী মাসের বইয়ের পরিচয় দেওয়া থাকে।

নাইস্ বুক ক্লাবের

বিজয় অভিযান !

*

প্রথম আবির্ভাবের মাত্র ছ' মাসেই ক্লাবটি যেভাবে পাঠক মহলে বিস্ময় সঞ্চার করেছে, তাতে আগামী ক'মাসে এর সদস্য সংখ্যা' বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, সন্দেহ নেই। এখনই এই ক্লাবের সদস্য ছড়িয়ে পড়েছেন সুদূর আসাম থেকে বোম্বাই পর্যন্ত !

ক্লাবের নিয়মিত সদস্যরা (অর্থাৎ যাঁরা পরপর অন্তত চার মাস বই নিয়েছেন) ক্লাবের নির্বাচিত বইএর সঙ্গে বাজারের অন্য যে কোন বই ক্লাবের মাধ্যমে টাকায় ১০ পয়সা কম দামে পাবেন। "নাইস্ বুক ক্লাব"-এর সদস্যপদ এমনি সম্মানজনক, এমনি লোভজনক !

এখনি কুপন পূরণ করে পাঠান...

নাইস্ বুক ক্লাব (অ্যাল্ফা-বিটা)

৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

আমাকে ক্লাবের সদস্য করে নেবেন। ৮০ পয়সার ডাকটিকিট রেজিসট্রেশন ফী স্বরূপ পাঠালাম। কোন্ কোন্ বই এখন পাঠাবেন, লিখে দিলাম। ডাক-খরচ সমেত ভি পি করবেন।* বই পৌঁছলেই দাম দিয়ে দেব। ছ'মাসে ছ'খানি বই কেনার প্রতিশ্রুতি দিলাম; তারপরে ইচ্ছা হলে সদস্য থাকতে পারি। এক মাস আগে জানিয়ে সদস্যপদ ছাড়তে পারি।

নাম :

ঠিকানা :

*অগ্রিম দাম পাঠালে (৭৫ পয়সা রেজিষ্ট্রি ডাক খরচ সমেত) ভিপি খরচ কমপক্ষে ২০ পয়সা আপনার বাঁচে। একই অর্ডারে এক সঙ্গে ছ'মাসের বই নিতে পারলে টা ২-৭৫ ডাকখরচ বাঁচে। চেক কেবলমাত্র & Co. ক্রশ করবেন।

অ্যালফা-বিটার
বাংলা বই ও পত্রিকা

গল্প-উপন্যাস

শার্লক হোম্‌স্ ফিরে এলেন : কোনান ডয়াল : অনুবাদ অদ্রীশ বর্ধন

২য় মুদ্রণ ১০৲

চোর কুঠুরির আলো : 'গোরা' ৫·৭৫

ঢেউভাঙ্গা মুক্তা : আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য ৬·৭৫

মাটি ও পৃথিবী : সুখেন্দু সরকার ২·৭৫

দুটি গোলাপ একটি কুঁড়ি : সুখেন্দু সরকার ৫.২৫

কালো মাটি রাঙা মন : নবফুল ৫·৭৫

কিংবদন্তির প্রেমকথা : নবফুল ২·৫০

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি : নারায়ণ চক্রবর্তী ৪·৫০

পিয়াসা : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ৮৲

অভিসার : অসিত চৌধুরী ৩·৭৫

নতশির উর্মি : গ্রেগরী মুখার্জী ৫৲

হৃদয়ের স্বাক্ষর : জগদীশপ্রসাদ দাশ ৪৲

ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী : শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা 'শরদ'

এবং নির্মলেন্দু গৌতম ২·৫০

ঝড়ো ফুল : সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৫৲

নেবু রায় : পল্লব রায় ৩·৫০

আর এক জন্ম আর এক আকাশ : কল্যাণ জানা ২·৭৫

তিন অঙ্কে এক অঙ্ক : রাধাগোবিন্দ দাস ৫·৫০

রকেট বই

রকেট সিরিজ উপন্যাস

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ : মনোরঞ্জন দে ৮০ প.

ভূগর্ভে টার্জন : ” ” ৩৲

অন্ধ যে-দেশে সকলেই : ” ” ১'৭৫

রোবার হলেন আকাশরাজা : অদ্রীশ বর্ধন ১'৭৫

সমুদ্র শয়তান : অদ্রীশ বর্ধন ৪৲

ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেণ্ট : অদ্রীশ বর্ধন ২৲

রামধনু-রঙ মানিক : আদিত্য ভট্টাচার্য ২৲

রোমাঞ্চকর নতুন পৃথিবী : আদিত্য ভট্টাচার্য ১'৭৫

মঙ্গলের ভয়ানক রক্তমণি : শ্রীধর সেনাপতি ১'৭৫

মানুষ-জন্তুর দ্বীপে : প্রদীপ মিত্র ১'৭৫

পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে : গৌরীশংকর দে ১'৭৫

মরণ ঘুম : অজয় হোম ১'৭৫

চারশো পঞ্চান্ন দিন পরে : মতি মুখোপাধ্যায় ১'৭৫

অগ্নির দেবতা হেফেসটাস : ডকটর দিলীপ রায় চৌধুরী ১'৭৫

যমালয়ে ১৯৯৭ : নকুল মুখোপাধ্যায় ১'৭৫

সুমেরুর বিভীষিকা : রণেন ঘোষ ২৲

হাতোপাচেক বেলুন চেপে : অদ্রীশ বর্ধন ২৲

নাটক

মুক্তি সংগ্রাম : অজিত কুমার সেনগুপ্ত ১৲

যমালয়ে ১৯৯১ : নকুল মুখোপাধ্যায় ১·৭৫

নতুন জীবন : অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪·৭৫

অমৃতস্য পুত্রা : সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৲

যুগ্ম পুষ্প ও দুই সখী : সুহাসিনী দাস ১·৫০

প্রবন্ধ, রম্যরচনা

বাঁচতে সবাই-চায় : অসীম বর্ধন (২য় সং) ৩·৭৫

পূর্বপক্ষ : জৈমিনি ৪৲

ওঙ্কার কথামৃত : কিঙ্কর অজিতকুমার ৪৲

পত্র-পত্রিকা

আশ্চর্য!

(৫ম বর্ষ চলছে)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক সত্যজিৎ রায় ॥ বার্ষিক ১৮৲

সুখী মন

(২য় বর্ষ চলছে)

সম্পাদক অসীম বর্ধন ॥ বার্ষিক ৪৲

অ্যাল্ফা-বিটা পাবলিকেশন্স্

মনোরম গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রকাশক

৭১-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

ফোন : ৩৪-৭২৭৪

Regd. C-118 ASCHORJO ! February 1967 Re 1·50

তিন অঙ্গে এক অঙ্গ

রাধাগোবিন্দ দাস

দীর্ঘ বিস্তারিত এই উপন্যাসটি সমাজ-সংস্কৃতির আলো-হাওয়ার মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক গল্পকথার সবটুকু সমারোহ এনেছে বার করে। শিক্ষিত মনের যুক্তি আর চিন্তাধারার সঙ্গে বর্ণাঢ্য নাটকীয় শৈলী মিলেমিশে সমগ্র গল্পটি প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন থেকেই মনকে কেড়ে নিয়ে রাখে, উদ্‌গ্রীব করে রাখে, ছুটিয়ে নিয়ে যায় শেষ পৃষ্ঠায়। টা ৫.৫০

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্ ॥ মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক

৭৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪